ইলহামী তৌযীহে মরাম

(ঐশী লক্ষ-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
নাহমাদুহূ ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম

মসীহের পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার আগমন

মুসলমানদের এবং খৃষ্টানদের কিছু মতবিরোধ থাকার পরও এই ব্যাপারে তাহারা উভয়েই একমত যে, হযরত ঈসা (আঃ) এই মাটির দেহ লইয়া আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন এবং তিনি আবার কোন এক সময়ে পৃথিবীতে আগমন করিবেন। আমি এই ধারণার অসারতা আমার এই পুস্তিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং ইহাও লিখিয়াছি যে, এই নুযূলের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইহা বুঝায় না যে, তিনিই আসিবেন বরং তাঁহার সদৃশ এক ব্যক্তি আসিবেন-এই খবর দেওয়া হইয়াছে। যাহার প্রকাশ এই অধমই। আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নিদর্শন ও ইলহাম দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমার এই রায় প্রকাশিত হওয়ার পরে যাহার উপরে আমি প্রকাশ্য ইলহামসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি– আমার বিরুদ্ধে বহু লেখনী ধারণ করা হইবে এবং এক আশ্চর্য ও অস্বীকারের মিশ্রিত সূর জনসাধারণের মধ্যে ধ্বনিত হইবে। এবং আমার ইচ্ছা ছিল যে, কার্য্যতঃ আমি কথা বাড়াইব না এবং আপত্তি উত্থাপনকারীদের আপত্তি উপস্থাপন করিবার সময়ে উহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জবাব দান করিয়া তাহাদের আপত্তির দফা রফা করিব এবং তাহাদের চিন্তাধারা অনুসারে দলীল পেশ করিব। কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে যে, আমার এই চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি আছে। কেননা, আমার এই ব্যাপারে কলম না ধরিবার কারণে শুধু সাধারণ মানুষই নয় এমনকি বিশেষ বিশেষ মানুষ যাহাদের মধ্যে অনেক মৌলবীও আছেন তাহারা তাহাদের এই প্রাচীন ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, ঈসা (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন, বুঝিবার ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে যাহা তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটিতে বাধ্য এবং যেহেতু তাহারা প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য তাহাদের পক্ষে অযথা আমার কথাকে রদ করিবার জন্য খাড়া হইয়া যাইবেন এবং স্বীয় দাবীর তরফদার হইয়া সর্ব অবস্থাতেই তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে চাহিবেন। সুতরাং দাবীদার হইয়া আমার মোকাবেলায় দন্ডায়মান হওয়া তাহাদের জন্য বড় কঠিন বাধার সৃষ্টি করিবে। যে পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসা তাহাদের জন্য বড় কঠিন হইবে। এবং নিজেদের প্রচারিত রায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করা তাহাদের জন্য মুশ্‌কিল হইবে বরং অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কেননা, সর্বদাই ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন মৌলবী যখন কোন কথা বলে এবং তাহার দলীল প্রমাণ দ্বারা অকাট্য বলিয়া কোন রায় জনসমক্ষে প্রকাশ করে তখন তাহা হইতে ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে মৃত্যুর শামিল অথবা তাহা হইতেও কঠিন মনে হয়। এইজন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি ইহা

চাহিয়াছি যে, তাহারা জিদ এবং হঠকারিতায় ফাঁসিয়া যাইবার পূর্বে আমি নিজেই তাহাদিগকে এমন পরিষ্কারভাবে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করি যেন কোন বুদ্ধিমান ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যান্বেষীর জন্য সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ইহা যথেষ্ট হয়। যদি পরে লিখিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে হয়ত ঐ ধরনের লোকের জন্য প্রয়োজন হইবে যাহারা অতিশয় সাদাসিদা এবং একেবারেই নির্বোধ, এবং যাহাদের আসমানী কিতাবের রূপক উদাহারণসমূহের কোন জ্ঞান নাই, এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞানের কোন খবর তাহারা রাখে না বরং উহাকে স্পর্শও করে নাই এবং 'লা ইয়ামাসসাহু'-এর নিষেধের ভিতরে তাহারা অন্তর্ভুক্ত।

এখন আমি বর্ণনার স্পষ্টতার খাতিরে ইহা লিপিবদ্ধ করিতে চাই যে, বাইবেল এবং আমাদের হাদীস গ্রন্থাবলীতে এবং অন্যান্য কিতাবে যে সমস্ত নবীর আকাশে গমনের ধারণা করা হয় তাহাদের সংখ্যা দুইজন-একজন ইয়ূহান্না বা যাহার যাহার নাম ইলিয়া এবং ইদ্রীসও রাখা হয়। দ্বিতীয় মসীহ ইবনে মরিয়ম যাহাকে ঈসা এবং ঈসূও বলা হয়। এই দুই নবীর সম্পর্কে পুরাতন নিয়ম এবং নূতন নিয়মে কোন কোন সহীফাতে এই ধরনের বর্ণনা আছে যে, তাহাদের দুইজনকে আকাশের দিকে উঠানো হইয়াছে, অতঃপর ভবিষ্যতে কোন এক যুগে তাহারা আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন এবং তোমরা তাহাদিগকে আসমান হইতে আগমন করিতে দেখিবে। এই কিতাবগুলির সাথে সামঞ্জস্য রাখে এই ধরনের কিছু হাদীসও আছে যাহাদের বর্ণনা বাইবেলের সাথে মোটামোটি মিলে। কিন্তু হযরত ইদরীস-এর সম্পর্কে (যাহাকে ইয়ূহান্না এবং ইলিয়া বলিয়াও ডাকা হয়), বাইবেলে এই ফয়সালা দেওয়া হইয়াছে যে, ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া পয়দা হওয়ায় ইলিয়ার আকাশ হইতে অবতরণ বাস্তবায়িত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত মসীহ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন, "ইয়ূহান্না নামে যাহার আসিবার কথা ছিল ইনিই তিনি। যদি ইচ্ছা হয় কবুল করিতে পার"। সুতরাং এক নবীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন আকাশগামীর দ্বিতীয়বার আগমনের হাকীকত ও কৈফিয়ত তো আমরা জানিতে পারিলাম। সুতরাং সমস্ত খৃষ্টানগণের ইঞ্জিলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে সর্ববাদীসম্মত ঐক্যমত-ইহাই হওয়া উচিত যে, হযরত যাকারিয়ার ঘরে যে সন্তান জন্ম হইয়াছে যাহার নাম ইয়াহইয়া তিনিই ইয়ূহান্না। কেননা, তিনি ইয়াহ্ইয়া তাহার (ইয়ূহান্নার) স্বভাব এবং গুণাবলীতে গুনান্বিত হইয়া আসিয়াছেন। যাহার আগমনের অপেক্ষায় সবাই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি ঈসা (আঃ)-এর সময়ে এইভাবে আগমন করিয়াছেন। অবশ্য ইহুদীরা এখনও তাহার আগমনের অপেক্ষায় আছে। তাহাদের বর্ণনা হইল, তিনি সত্য সত্যই আকাশ হইতে আসিবেন। প্রথমে তিনি বায়তুল মুকাদ্দসের মিনারে অবতরণ করিবেন। তারপর সমস্ত ইহুদীগণ একত্রিত হইয়া তাহাকে কোন সিঁড়ি লাগাইয়া সেখান হইতে নামাইয়া আনিবেন। যখন ইহুদীদের সামনে এই ব্যাখ্যা পেশ করা হয় তখন রাগে গরগর করিতে থাকে এবং হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইয়াহ্ইয়ার সম্বন্ধে অশ্লীল কথা বলিতে থাকে। এবং ঐ নবীর কথাকে একটি ভ্রান্ত ঈমান হানিকর আকীদা বলিয়া মনে করে। মোট কথা হইল এই যে, আসমান হইতে অবতরণ এই কথার যে ব্যাখ্যা হয় তাহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা হইতে উহার হাকীকত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এবং তাহার বর্ণনা হইতে ইয়ূহান্নার আকাশ হইতে (সশরীরে) আগমনের ঝগড়া মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং এই কথা শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, যদি নাযেল হয় কেহ তবে তিনি কীভাবে নাযেল হইবেন। কিন্তু মসীহের অবতরণের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বড় জোশের সাথে বয়ান করা হয় যে, তিনি খুবই সুন্দর রাজকীয় পোষাকের সাথে সজ্জিত হইয়া যাহার মধ্যে জরী* থাকিবে ফিরিশ্তাদের সাথে আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন

কিন্তু এই দুই জাতির মধ্যে এই ব্যাপারে মতৈক্য নাই যে, তিনি কোথায় অবতরণ করিবেন। তিনি কি মক্কা মুয়ায্যামায় অবতরণ করিবেন নাকি লন্ডনের কোন গীর্জার উপরে অথবা মস্কোর কোন রাজকীয় মন্দিরে। যদি খৃষ্টানদের হেদায়াতের পথে পুরাতন ভ্রান্তির দ্বিতীয়বার অনুকরণের দ্বারা বাধার সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে তাহাদের মুসলমানদের সম্পর্কে খুব শীঘ্রই ইহা বুঝা উচিত যে, মসীহের আগমন ঐভাবেই আকাশ হইতে অসম্ভব যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ) নিজে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা, ইহাতো সম্ভব নহে যে, একই প্রকারের দুইটি বিষয় দুইভাবে বিপরীতমুখী দুইটি রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন তাহাদের চিন্তার খোরাক হইবে যে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর ঐ ব্যাখ্যা যাহা তিনি ইয়ূহান্নার আকাশ হইতে অবতরণ সম্পর্কে করিয়াছেন তাহা হযরত মসীহ (আঃ)-এর আকাশ হইতে অবতরণ সম্পর্কে কি করা উচিত নয় যখন দুইটি ব্যাপারই একই প্রকারের যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক নবী এই গুপ্ত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং কানুনে কুদরত ও ইহাই চায় এবং সৃষ্টির নিয়মাবলী ইহাকেই সমর্থন করে তখন একটি সহজ সরল রাস্তা ছাড়িয়া এক বক্র এবং আপত্তিযোগ্য রাস্তা নিজের তরফ হইতে খুঁদিয়া বাহির করা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। জ্ঞানবান, ঈমানদার এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যাহারা হযরত মসীহের বর্ণনার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহারা কি অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে পারেন। এবং খৃষ্টানগণতো আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে তাহাদের স্বীয় এই ভবিষ্যদ্বাণী ইংরেজী পত্রিকায় ছাপাইয়াছেন। যে, আগামী তিন বৎসরের ভিতরে মসীহ (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। এখন যখন আল্লাহ্তাআলা সেই আকাশ হইতে অবতরণকারীর নিদর্শন দিয়াছেন তখন সবার আগে খৃষ্টানদের উচিত তাহাকে কবুল করা যেন নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণীর নিজেরাই মিথ্যা সাব্যস্তকারী না হন। (চলবে)

অনুবাদ : **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**

---

* এই সব কাপড় পশমী বা রেশমী জাতীয় হইবে? যেমন ঃ চোড়িয়া (ডোরাদার কাপড়) গুলবদন (চুড়িদার রেশমী কাপড়), আতলস (সার্টিন) কমখাব (জরির সুতা) মিশাইয়া বোনা কাপড়, যরবফত (জরিদার কাপড়), যরীলাহী (জরিদার রেশমী কাপড়), অথবা সাধারণ সুতি কাপড় যেমন ন্যানসুখ (চোখ জুড়ানো কাপড়), তনযেব (অতিচিকণ সুতা দ্বারা বোনা কাপড়) এঙ্গ চিকণ (কারুকার্য বিশিষ্ট কাপড়) গুলশন (ফুলদার কাপড়) মলমল, জালী, খাস্সা (অতীব শুভ্রসুতা দিয়া বোনা কাপড়), ডোরিয়া (ডোরাদার চিকণ কাপড়) আরও চারখানা। আকাশে এইসব কাপড়কে কে বুনিয়াছে এবং কে সিলাই করিয়াছে, কোন মুসলমান বা খৃষ্টান আজ পর্যন্ত ইহার সন্ধান দেয় নাই।

তৌযীহে মরাম
(ঐশীলক্ষ-বস্তুর বিশ্লেষণ)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
(২য় কিস্তি)

খৃষ্টানগণ এই কথাও স্বীকার করেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে উঠাইয়া নেওয়ার পরে তিনি বেহেশ্‌তে দাখিল হইয়াছেন। লুক বর্ণিত ইঞ্জিলে এক চোরকে সম্বোধন করিয়া হযরত মসীহ নিজে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিতেছেন, "আজ তুমি আমার সাথে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে" *(লুক বর্ণিত সুসমাচার, অধ্যায় ২৩ শ্লোক ৪৩)*।

খৃষ্টানদের এই ধারণাও সর্ববাদিসম্মত যে, কেহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিলে সেখান হইতে আর বাহির হইয়া আসে না। অথবা তাহাকে সেখান হইতে বাহির করা হয় না সে যত তুচ্ছ মর্যাদার মানুষই হোক না কেন। অনন্তর মুসলমানদেরও ইহাই ধর্মীয় বিশ্বাস। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন শরীফে বলিয়াছেন "ওয়া মা হুম মিনহা বেমুখরাজীন।" অর্থাৎ যে সমস্ত লোককে একবার বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান হইবে তাহাদিগকে আর বেহেশত্ হইতে বাহির করা হইবে না (সূরা হিজরঃ আয়াত ৭৯)। যদিও কুরআন শরীফে কোথাও হযরত মসীহকে বেহেশ্‌তে দাখিল করার কথা উল্লেখ নাই তবে তাহার মৃত্যুর কথা তিনবার উল্লেখ আছে। "ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাতানি কুনতা আনতার রাকীবা আলায়হিম" (সূরা মায়েদা ১১৮ অর্থ: (অতঃপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের রক্ষক ছিলে) ওয়া ইম্মিন আহলিল কিতাবে ইল্লা লাইউমেনুন্নাবিহি কাবলা মাওতিহি (সূরা নেসা ১৫৯ অর্থ: এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কেহ থাকিবে যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না)।

(ইয কৃলাল্লাহু ইয়া ঈসা ইন্নি মুওয়াতা ফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া (আলে ইমরান ঃ ৫৬ অর্থ-এবং যখন আল্লাহ্‌তাআলা বলিবেন, হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমার মৃত্যু দানকারী এবং আমার দিকে উত্তোলনকারী)।

এবং পবিত্র বান্দাদের জন্য ওফাত পাওয়া বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়া একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ক্বিলাদ খুলিল জান্নাতা ওয়া আদখুলি জান্নাতি– এই দুই আয়াতের অর্থ অনুসারে তাহাদিগকে সোজাসুজি বেহেশ্‌তে দাখিল করান হয়। এখন মুসলমানদের এবং খৃষ্টানদের দুই দলেরই এই ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্ত করা উচিত যে, মসীহের মত নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বেহেশ্‌তে দাখিল করার পরে তাহাকে আবার বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করা কি সমীচিন হইবে?

খোদাতাতাআলার জন্য এই ধরনের ওয়াদা খেলাফি তো জায়েয হইতে পারে না। যেখানে সমস্ত কিতাবে ইহা পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, যাহাকে একবার বেহেশ্‌তে দাখিল করা হয় তাহাকে আর সেখান হইতে বাহির করা হয় না। এই ধরনের বুযর্গ এবং তাহার সাথে খোদাতাআলার এই ধরনের অকাট্য ওয়াদা ভঙ্গ করা তাঁহার সমস্ত ওয়াদার উপরে এক ভূমিকম্প কি সৃষ্টি করিবে না? সুতরাং ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর যে, এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে শুধু মসীহ্‌কেই বিপদে ফেলা হয় না এবং এই ধরনের বাজে কথায় আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানি করা হয় এবং অতি নিম্নস্তরের বেয়াদবী করা হয় খোদাতাআলার শানের সাথে। এই বিষয়টিকে গভীর অভিনিবেশের সাথে এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণার সাথে দেখা উচিত যে, একটি নিম্নমানের বিশ্বাস যাহা হইতে বাঁচার জন্য রূপকের রাস্তা খোলা আছে অথচ এই বিশ্বাস রাখিলে বড় বড় ধর্মীয় সত্যতাকে নিজে হাতে বিসর্জন দিতে হয়। এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে এমন এক বস্তা পচা বিশ্বাস যাহাকে রক্ষা করিতে হইলে হাজারো খারাবী এবং দলের পর দল মস্তিষ্কের অস্থিরতা আসিয়া ভীড় জমায় এবং মোখালেফদের জন্য হাসি এবং বিদ্রুপের সুযোগ হাতে আসিয়া যায়। আমি ইতঃপূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে, এই মু'জেযা মক্কার কাফেরগণ আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সঃ)-এর নিকট চাহিয়া বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদের চোখের সামনে আকাশে আরোহণ করুন এবং সেখান হইতে আমাদের চোখের সামনে কিতাব লইয়া অবতীর্ণ হন। এবং তাহারা এই জবাব পাইয়াছিল, "কুল সুবহানা রব্বি" [বল আল্লাহ্ আমার প্রভু পবিত্র]।

খোদাতাআলার প্রজ্ঞাপূর্ণ মর্যাদা ইহা হইতে পবিত্র। তিনি এই পৃথিবী যাহা পরীক্ষার স্থান সেখানে এই ধরনের খোলাখুলি নির্দশন দেখান না এবং ঈমান বিল গায়েব এর হিকমতকে নষ্ট হইতে দেন না। এখন আমি বলিতেছি যে, যে বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর জন্য জায়েয মনে করা হয় নাই এবং আল্লাহ্‌র নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া মনে করা হইয়াছে তাহা হযরত মসীহের জন্য কীভাবে জায়েয মনে করা যাইতে পারে? ইহা চরম বেয়াদবী হইবে যে, একটি বিষয় আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জন্য অসম্ভব মনে করি এবং সেই গুণটিই আমরা হযরত মসীহের জন্য সম্ভব মনে করি। কোন সত্যিকারের মুসলমানের জন্য এই ধরনের গোস্তাখী করা কি সম্ভব? কখনও নহে। এবং এই কথাও প্রকাশ থাকে যে, এই যে ধারণাটি কিছুদিন যাবৎ আমাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে আমাদের কোন কিতাবে ইহার নাম নিশানও নাই; বরং নবী (সঃ)-এর হাদীসসমূহ বুঝিবার ব্যাপারে এক বিভ্রান্তির ইহা নামান্তর মাত্র যাহাদের সাথে কিছু অবান্তর পাদটীকা সংযোজন করা হইয়াছে; এবং কিছু ভিত্তিহীন কথা-বার্তা দ্বারা উহাদের অলংকৃত করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলীকে অবলীলাক্রমে নজর-আন্দাজ করা হইয়াছে যাহা পাঠ করিলে আসল মকসুদ সম্পর্কে সহী এলম হাসিল হইত। এই ব্যাপারে হযরত ঈসমাইল বুখারী (রঃ) আমাদের নবী (সঃ)-এর যে হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রেওয়ায়াত করিয়াছেন তাহা এই-কায়ফা আনতুল ইযা নাযলা বনু মরিয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম অর্থাৎ ঐ দিন তোমাদের কি অবস্থা হইবে যে দিন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি কে? তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন। তিনি তোমাদেরই মধ্যে পয়দা হইবেন। এই হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) সাফ সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে, ইবনে মরিয়ম বলিতে এ কথা মনে করিও না যে, মসীহ ইবনে মরিয়মই অবতরণ করিবেন; এবং এই নামকে রূপক হিসাবে

ব্যবহার করা হইয়াছে। অন্যথা তিনি প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জাতির মধ্যে পয়দা হইবেন। তোমাদের একজন ইমাম হইবেন যাহাকে ইবনে মরিয়মের গুণাবলী দিয়া পয়দা করা হইবে। এখানে প্রাচীন ধারণার বশবর্তী লোকেরা এই হাদীসের এই ধরনের অর্থ করিয়া থাকে যে, যখন মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন তখন তিনি তাহার নবুওয়ত হইতে ইস্তফা দিয়া আসিবেন। ইঞ্জীলের সাথে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে দাখেল হইয়া কুরআন শরীফের উপরে আমল করিবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবেন এবং নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিবেন। কিন্তু এখানে একথা বলা হয় নাই কেন, কী কারণে তাহার এই অধঃপতন ঘটিবে। যাহাই হউক আমাদের ভাই মুসলমান মুহাম্মদীরা এইটুকু পর্যন্ত নিজেরা মানিয়া লইয়াছেন যে, ইবনে মরিয়ম ঐ দিনে একজন মরদে মুসলমান হইবেন যিনি নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিবেন, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে জাহির করিবেন; এবং স্বীয় নবুওয়তের নামও নিবেন না যাহা তাহাকে প্রথমে দান করা হইয়াছিল। এবং প্রকৃতপক্ষে রূপককে বাস্তব বলিয়া মনে করিবার কারণে আমাদের ভাইয়েরা এই কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছেন। যাহার কারণে তাহাদিগকে এক নবীকে তাহার মনসবে নবুওয়ত হইতে মাহরূম হইয়া যাওয়া তাহাদের জায়েয মনে করিতে হইয়াছে। যদি তাহারা এই সাফ এবং সিধা মানেটি মানিয়া নেয় যাহা আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র বাণীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে– যাহার সম্পর্কে ইতঃপূর্বে হযরত মসীহ ইউহান্না নবী সম্পর্কে বয়ান করিয়াছেন– তাহা হইলে তাহারা এই সমস্ত কঠিন বানায়োটি সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। হযরত মসীহের রূহকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিবার প্রয়োজন হইবে না। এবং সেই পবিত্র নবীকে তাহার নবুওয়ত হইতেও বরখাস্ত করিতে হইবে না। এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর শানেও কোন বেয়াদবী করিতে হইবে না এবং কুরআনের আহকামকেও মনসুখ করিতে হইবে না।

সম্ভবতঃ আমাদের ভাইদের শেষ ওজর-আপত্তি ইহা হইতে পারে যে, কোন কোন কথা যাহাদের সহীহ হাদীস মোতাবেক হযরত মসীহ সম্বন্ধে পাওয়া যায় সেই সমস্ত আলামতকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথাঃ লিখা আছে যে, মসীহ যখন আসিবেন তখন তিনি ক্রুশকে ধ্বংস করিবেন, জিযিয়াকে রহিত করিবেন এবং শূকর বধ করিবেন। এবং সেই সময় তিনি আসিবেন যখন ইহুদী এবং খৃষ্টানগণের বদ অভ্যাস মুসলমানদের মধ্যে প্রসার লাভ করিবে। আমি বলি যে, ক্রুশকে ধ্বংস করিবার অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বাহ্যিক যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবেন বরং রূহানীভাবে ক্রুশ ধর্মকে ধ্বংস করা এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে এই ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা। জিযিয়া কর উঠাইয়া দেওয়ার মানেও আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া যায় যে, ঐ সময়ে মানুষের হৃদয় আপনা-আপনিই সত্য এবং সত্য ধর্মের দিকে ধাবিত হইবে, কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। নিজে নিজেই এই ধরনের বায়ু প্রবাহিত হইবে যে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিবে। অনন্তর যখন ইসলামে প্রবেশ করার দরজা খুলিয়া যাইবে এবং বিশ্বের সবাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিবে তখন জিযিয়া কর কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা চট করিয়া ঘটিবে না। হাঁ, এখন ইহার ভিত্তিস্থাপন করা হইবে। আর শূকরের অর্থ হইতেছে শূকর প্রকৃতির লোক। ঐ দিন তাহাদিগকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে পরাজিত করা হইবে এবং পরিষ্কার দলীল-প্রমাণের তলোয়ার তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এইরূপ নহে যে, একজন পবিত্র নবী বনে জঙ্গলে শূকর বধ করিয়া বেড়াইবেন।

হে আমার প্রিয় জাতি! এই সকলই রূপকভাবে বলা হইয়াছে (যাহাকে ইশ্‌তেয়ারা বলে)। যাহাদেরকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা যে শুধু সহজে বুঝিতে পারিবে তাহা নহে বরং এক ধরনের আসক্তির সাথে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে। এই ধরনের সুন্দর উপমা এবং প্রাঞ্জল রূপকের ব্যবহার যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে বাস্তবে চিত্রায়িত করিবার মানে হইতেছে এক সুন্দর প্রেমাস্পদকে এক ভয়ানক দৈত্যরূপে মূর্তি বানানো। ভাষার প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষতা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সূক্ষ্ম রূপকের ব্যবহারের উপর। এইজন্য খোদাতাআলার কালামের মধ্যে এই ধরনের রূপকের ব্যবহার হইয়াছে এত বেশী যাহা অন্য কাহারও রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এখন এই পবিত্র কালামের পাকিজা (পবিত্র) রূপকগুলিকে প্রত্যেক জায়গায় ও প্রত্যেক অবস্থায় হাকীকতে রূপান্তরিত করিলে এই কালামের নেজামের যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়ার শামিল হইবে। ফলে খোদাতাআলার প্রাঞ্জলভাষার কালামের আসল উদ্দেশ্যই শুধু এই তরীকাতে ব্যহত হয় না বরং সাথে সাথে এই কালামের সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতাও নষ্ট হইয়া যায়।

খুব সুরৎ এবং হৃদয়গ্রাহী তফসীর উহাই হইয়া থাকে যাহাতে, যিনি কথা বলেন তাহার উচ্চ মর্যাদা এবং বাচনভঙ্গির প্রাঞ্জলতা, এবং তাহার আধ্যাত্মিক এবং উচ্চ মার্গের অভিলাষও প্রকাশ পায়; এবং নেহায়েত নীচের স্তরের, বিশ্রী এবং স্থূল অর্থের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাহা বিদ্রূপ ও ঠাট্টার স্তরে পৌঁছিয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা মোটেই উচিত নয়। নিজের তরফ হইতে যাহা খোদার পাক কালাম যাহা সূক্ষ্ম ও কঠিন তত্ত্বের কথায় পরিপূর্ণ উহাকে রূঢ় কথায় পরিপূর্ণ মনে করা উচিত নহে। আমরা বুঝিতে পারি না কেন সেই নেহায়েৎ কঠিন গুপ্ত রহস্যের মোকাবেলায়, যাহা খোদার কালামের মধ্যে নিহিত থাকা উচিত এবং অবশ্যই আছেও, কেন বিশ্রী, স্থূল এবং ঘৃণ্য অর্থ পছন্দ করা হয়? এবং কেন সেই সূক্ষ্ম অর্থের কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না যাহা খোদাতাআলার অতি উচ্চ শানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাহার প্রতি উচ্চ মরতবার কালামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়? এবং আমাদের ওলামাগণের মস্তিষ্ক কেন এই অহেতুক অহংকারে পরিপূর্ণ যে, তাহারা এই এলাহি দর্শনের নিকটবর্তী হইতে চাহে না? যেই সমস্ত লোকেরা নিজেদের রক্ত ও ঘর্ম এই গবেষণায় এক করিয়া দিয়াছেন তাহাদের কাছে আমাদের কথা খুব মজাদার মনে হইবে এবং তাহারা কখনও আমাদের মতবাদ অস্বীকার করিবে না এবং এক তাজা সত্য তাহারা লাভ করিবে, যাহা তাহারা খুব উৎসাহের সহিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবে এবং পাবলিককে এক আধ্যাত্মিক স্বাদ গ্রহণ করাইবে। কিন্তু যাহারা তাহাদের চিন্তা ও চেতনাকে এক উদাসীন দৃষ্টি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন তাহারা নাহক এতেরাজের পাল্লা ভারী করা ছাড়া এবং ইসলামকে লাঞ্ছিত করা ছাড়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ইসলামের আর কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না। (চলবে)

অনুবাদ– **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**

অমৃত বাণী

তৌযীহে মরাম

লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)

(তৃতীয় কিস্তি)

এখন আমরা ইহা বয়ান করিতে চাই যে, আমাদের হাদী, সাইয়্যেদ ও মৌলা জনাবে খতমুল মুরসালীন (সঃ) মসীহে আওওয়াল ও মসীহে সানীর মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য শুধু ইহাই বলেন নাই যে, মসীহ সানী এক মরদে মুসলমান হইবেন এবং শরীয়তে কুরাআনী অনুসারে আমল করিবেন এবং মুসলমানদের মতই নামায রোযা এবং কুরআনের হুকুম আহকাম অনুসারে চলিবেন, এবং মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হইবেন এবং তাহদের ইমাম হইবেন এবং অন্য কোন ধর্ম আনয়ন করিবেন না এবং কোন স্বতন্ত্র নবুওয়তের দাবী করিবেন না, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে, মসীহ আওওয়াল ও মসীহ সানীর শারীরিক গঠনের মধ্যেও পরিষ্কার পার্থক্য থাকিবে। সুতরাং হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর মি'রাজের রাত্রিতে হযরত মসীহের সাথে যে দেখা হইয়াছে সেই বর্ণনা অনুসারে তাহার উচ্চতা মাঝারি ধরনের এবং গায়ের রং লাল এবং চুল কোঁকড়ানো ছিল এবং বক্ষঃ প্রশস্ত ছিল (দেখুন সহী বুখারী, পৃষ্ঠা ৪৮৯)। কিন্তু এই কিতাবেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মসীহে সানীর হুলিয়া (দৈহিক অবয়বের বর্ণনা) এইরূপ দিয়াছেন যে, তাহার গায়ের রং গন্দমের (গমের) মত হইবে এবং তাহার চুল কোঁকড়ানো হইবে না, এবং বাবরী কান পর্যন্ত লটকাইয়া থাকিবে। এখন আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা কি প্রমাণ হয় না যে, হযরত মসীহে আওওয়াল ও মসীহে সানী দুই পৃথক ব্যক্তি। ইহা কি ইয়াকীন করাইবার জন্য যথেষ্ট নহে। তাহাদের দুইজনকে ইবনে মরিয়মের নামে ডাকার মধ্যে এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে, যাহাকে রূপক বলা যাইতে পারে।

ইহা দুইজনের আধ্যাত্মিক মিল থাকার কারণে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা প্রকাশ থাকে যে, অভ্যন্তরীণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকার কারণে দুইজন নেক ব্যক্তিকে একই নামে ডাকা যাইতে পারে। তেমনিভাবে দুইজন দুষ্টলোকের মধ্যেও চারিত্রিক মিল থাকার কারণে একজনকে আর একজনের প্রতিনিধি বলা হইয়া থাকে। মুসলমান লোকেরা যে নিজেদের ছেলেদের নাম আহমদ, মূসা, ঈসা, সুলায়মান এবং দাউদ ইত্যাদি রাখিয়া থাকে। উহার অন্তর্নিহিত কারণও ইহাই যে, তাহাদের ছেলেরা কর্মজীবনে এই মহাপুরুষদের কর্মও করিবে- তাহারা ইহাই চিন্তা করে যে, তাহাদের ছেলেরা বড় হইয়া এই বুযর্গদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে- তাহাদের গুণাবলীতে এইভাবে নিজেদের মহিমান্বিত করিবে যে, তাহাদেরই রূপে

রূপান্তরিত হইবে। এখানে যদি এই আপত্তি করা হয় যে, মসীহ (আঃ) যেহেতু নবী ছিলেন এইজন্য তাহার যিনি মসীল হইবেন তিনিও নবী হইবেন তাহা হইলে ইহার জবাব এই যে, প্রথমতঃ আগমনকারী মসীহের জন্য আমাদের সায়্যেদ ও মওলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়তের কোন শর্ত আরোপ করেন নাই, বরং পরিষ্কারভাবে ইহাই লিখা আছে যে, তিনি একজন মুসলমান হইবেন এবং সাধারণ মুসলমানদের মতই কুরআন শরীফে বর্ণিত শরীয়তের পাবন্দ হইবেন এবং ইহার চাইতে আর কিছুই বলিবেন না যে, আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমানদের ইমাম। ইহা ছাড়া ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই অধম খোদাতাআলার তরফ হইতে এই উম্মতের জন্য একজন মুহাদ্দিসস্বরূপ আসিয়াছেন, এবং মুহাদ্দিসও এক অর্থে নবী হইয়া থাকে যদিও তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ নবুওয়ত থাকে না। কিন্তু আংশিকভাবে তিনি একজন নবী। কেননা, তিনি খোদাতাআলার সহিত বাক্যালাপ করার এক মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। গায়েবের ব্যাপারসমূহ তাহার উপরে জাহির করা হয় এবং রসূলগণের এবং নবীগণের ওহীর মত তাহার ওহীসমূহ ও শয়তানের দখল হইতে মুক্ত থাকে এবং শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য তাহার উপর প্রকাশিত হয়, এবং আরো ব্যাপার এই যে, নবীদের মতই তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আসেন এবং আম্বিয়াদের মত তাহার উপরেও ইহা ফরয হয় যে, তিনি উচ্চস্তরে তাহার আগমন ঘোষণা করেন। এবং যে ব্যক্তি তাহাকে অস্বীকার করে সে এক প্রকার শাস্তির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়, এবং নবুওয়তের অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি তাহার মধ্যে পাওয়া যায়।

যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, নবুওয়তের দরজা তো বন্ধ, এবং ওহী যাহা নবীগণের উপর নাযেল হইত উহার দরজা বন্ধ। কেননা, উহার উপরে মোহর লাগিয়া গিয়াছে, তাহা ইহলে আমি বলিব না সর্বপ্রকার নবুওয়তের দরজা বন্ধ হইয়াছে, না সর্বপ্রকার ওহীর উপরে মোহর লাগিয়াছে। বরং আংশিকভাবেই উম্মতের জন্য নবুওয়ত এবং ওহীর দরজা খোলা আছে চিরকালের জন্য। কিন্তু এই কথা মনযোগের সাথে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে নবুওয়তের যাহার দরজা চিরকালের জন্য খোলা আছে তাহা পরিপূর্ণ নবুওয়ত নহে– যাহার কথা আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি–তাহা এক আংশিক নবুওয়ত অন্য কথায় যাহাকে মুহাদ্দিসীয়ত নামে অভিহিত করা যায়–যাহা ইনসানে কামেলের একতেদা করিলে পাওয়া যায়– যাহা সমস্ত কামালাতের সমাহার– সমাহার নবুওয়তে তাম্মা –অর্থাৎ সেই মহান সত্তা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। সুতরাং জানিয়া রাখ তোমার নবীর (সঃ) এরশাদ হইতেছে, নবী হইতেছেন মুহাদ্দিস এবং মুহাদ্দিস হইতেছেন নবী। এই কথা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় নবী মুহাদ্দিস এবং মুহাদ্দিস নবী এই হিসাবে যে, ইহা নবুওয়তের একটি প্রকার ভেদ এবং হুযূর রসূলে করীম (সঃ) এ কথা বলিয়াছেন যে, মুবাশ্শিরাত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নবুওয়ত আর বাকি নাই। অন্য কথায় বিভিন্ন প্রকার নবুওয়তের মধ্যে শুধু একটি প্রকার নবুওয়ত বাকি আছে এবং তাহা হইল মুবাশ্শিরাত– উহা কী? উহা হইতেছে সত্য-স্বপ্ন এবং সত্য-কাশ্ফ এবং ঐ প্রকার ওহী যাহা বিশেষ ওলী আল্লাহ্দের কাছে নাযেল হইয়া থাকে এবং ঐ আলো যাহা তাহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্য কর, হে (স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) তোমার কাছে কি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, নবুওয়তের দরজা বন্ধ হইয়াছে সত্যই কিন্তু মুহাদ্দিসীয়তের দরজা খোলা আছে। কেননা, সহী হাদীসে ইহা বর্ণিত আছে যে, শরীয়ত বহনকারী ওহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ প্রকার নবুওয়ত জারি আছে যাহা দ্বারা মুবাশ্শিরাত লাভ করা যায় এবং ইহা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। এবং তোমরা নিশ্চয় পড়িয়াছ এবং জানিয়াছ যে, হাদীসে লেখা আছে যে, সত্য-স্বপ্ন হইতেছে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং সত্য-স্বপ্ন দ্বারা ঐ মরতবা লাভ করা যাইতে পারে যাহা মুহাদ্দিসরা আল্লাহ্র কালাম দ্বারা লাভ করিতে পারেন। সুতরাং মুহাদ্দিসীয়তের দরজা খোলা আছে। সুতরাং হে পাঠক! আল্লাহ্তাআলা তোমাকে সাহায্য করিবেন এই কথা বুঝিতে যে, আমাদের বক্তব্যের সার কথা হইল এই যে, নবুওয়তের বিভিন্ন দরজার মধ্যে এই দরজা সর্বদা খোলা আছে এবং খোলা থাকিবে, যে সমস্ত ওহী দ্বারা আল্লাহ্তাআলা মানুষকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন এবং গায়েবের কথা জানাইয়া থাকেন এবং সতর্ক করিয়া থাকেন যাহার মাধ্যমে ওলী আল্লাহ্রা এলমে-লাদুন্নী লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঐশী-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এবং ঐ পরিপূর্ণ নবুওয়ত যাহার দ্বারা ওহী কামালিয়তের দরজা লাভ করিয়াছে আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই কামালিয়ত শুধু হুযূর (সঃ)-ই লাভ করিয়াছেন যাহার পরে ঐ কামালিয়তের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেদিন 'মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির রিজালিকুম ওয়া লাকির রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্ নাবিঈন– নাযেল হইয়াছে । যদি এই কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে, সেই বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি এই অধম লাভ করিয়াছে তাহা হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সদৃশ। ঐ সাদৃশ্য কী? তো উহার জবাব এই যে, উহা চারিত্রিক গুণাবলীর সমাহার। যাহা আমাদের দুইজনের মধ্যে রূহানী শক্তিসমূহের এক বিশেষ প্রকারের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে যাহার সিলসিলা এক তরফ হইতে নিচের দিকে গিয়াছে এবং অপর দিক হইতে উপরের দিকে গিয়াছে। নিচের তরফের অর্থ হইতেছে এই যে, সেই উৎকৃষ্ট ধরনের সমবেদনা এবং সহমর্মিতা যাহা আল্লাহ্র নবী আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে পাইয়া থাকেন– যাহা দাঈ ইলাল্লাহ্ এবং তাহার শাগরেদদের মধ্যে এক নেহায়েত মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং নবী এবং তাহার সুশিক্ষিত শাগরেদদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে যাহার ফলে ঐ নূরানী কুয়্যত ঐ আধ্যাত্মিক আলোর শক্তি যাহা দাঈ ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ নবীর পবিত্র আত্মার মধ্যে মজুদ থাকে, তাহা তাহার সমস্ত সবুজ শাখাগুলির মধ্যে প্রসারিত হয়। উপরের তরফের অর্থ হইতেছে এই যে, সেই অতি উচ্চ স্তরের প্রেম যাহা শক্তিশালী ঈমানের দ্বারা পাওয়া যায় তাহা প্রথমে বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে পয়দা হইয়া থাকে। বান্দার সেই মুহাব্বত রব্বে কুদীর আল্লাহ্র মুহব্বতকে আকর্ষণ করে। অতঃপর এ দুই মুহব্বত একত্রিত হবার ফলে যাহা নর এবং নারীর মত তাহা এক মুহব্বতের চিরস্থায়ী সম্পর্ক এবং সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মিলনের এক কঠিন আকর্ষণ পয়দা করে। তখন মুহাম্মদ-ই-ইলাহীর আলো প্রজ্জ্বলিত হয় আগুনের মত এবং বান্দার মুহব্বতের যে আধার উহাতে নিপতিত হইয়া তৃতীয় জিনিষ সৃষ্টি হয় যাহার নাম রূহুল কুদুস। সুতরাং মানুষের এই পর্যায়ে আসিয়া এক নতুন আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ হয়। এই আধ্যাত্মিক জন্ম বা রূহানী পয়দাইশ ঐ সময়ে হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে যখন খোদাতাআলা নিজের বিশেষ ইচ্ছায় তাহার মধ্যে ঐ প্রকারের বিশেষ মুহব্বত পয়দা করিবেন এবং এই মকাম এবং এই মরতবা ঐশী মুহব্বতের এক বিশেষ ধরন যাহাকে রূপকের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, খোদাতাআলার মুহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ রূহ, মানুষের আত্মার ভেতরে আল্লাহ্র বিশেষ ইচ্ছা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহ্র ইচ্ছায় আল্লাহ্র মুহব্বতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্তাআলা তাহাকে এক নতুন জন্ম দান করিয়াছেন। এইজন্যই এই মুহব্বতে পরিপূর্ণ রূহ খোদাতাআলার রূহের সাথে এক পুত্রবৎ সম্পর্ক আছে একথা রূপকের ভাষায় বলা যাইতে পারে। কেননা, খোদাতাআলাই ইহার মধ্যে মুহব্বত ফুৎকার করিয়া প্রবেশ করাইয়া থাকেন। এবং যেহেতু রূহুল কুদুস এই দুই-এর মিলনের ফলে পয়দা হইয়া থাকে মানুষের দিলের মধ্যে এইজন্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা এই দুইএর পুত্রের মত এবং ইহাই পবিত্র তসলিস– যাহা এই দরজার মুহব্বতের জন্য জরুরী যাহাকে অপবিত্র ব্যক্তিগণ মুশরিকদের মত বুঝিয়া নিয়াছে; এবং সম্ভাবনার এক ধূলিকণাকে যাহা মানুষের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে এবং যাহার কোন হকীকত নাই তাহাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যিনি সর্বোচ্চ এবং নিজের সত্তায় অবশ্যই বিদ্যমান আছেন এবং অন্যদের অস্তিত্বের কারণ, তাহার সমান সমান জ্ঞান করিয়াছে।

কিন্তু এই জায়গায় যদি এই প্রশ্নের অবতারণা করা হয় যে, এই দরজা যদি এই অধম এবং মসীহের জন্য তসলীম করিয়া নেওয়া হয় তাহা হইলে জনাব সাইয়্যেদনা ও মৌলানা স্যায়েদুল কুল ওয়া আফযালুর রসূল খাতামান্নবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জন্য আর কোন্ দরজা বাকী রহিল। (চলবে)

অনুবাদ– **ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া**

তৌযীহে মরাম

লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)

(চতুর্থ কিস্তি)

এখন আঁ হযরত (সঃ)-এর অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য ইহা লিখা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং নৈকট্যের ক্রমানুসারে রূহানীয়্যতের দরজা তিন প্রকার হইয়া থাকে–সবচেয়ে নীচের দরজা-যদিও ইহাও একটি অতি উচ্চ দরজা– তাহা এই যে, আল্লাহ্‌তাআলার মহব্বতের আগুন মানুষের হৃদয়কে যদিও উত্তপ্ত করে তবু– এবং ইহাও সম্ভব যে, এই উত্তপ্ত জিনিসটি দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে আগুনের কাজও নেওয়া যায়-কিন্তু এইটুকু দুর্বলতা বাকী থাকিয়া যায় যে, ইহাতে আগুনের চমক পয়দা হয় না। এই দরজার মহব্বতের উপর যখন আল্লাহ্‌র মহব্বতের স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়ে তখন এই স্ফুলিঙ্গ দ্বারা রূহের উপরে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তখন মানবাত্মা চিত্তের স্থিরতা এবং নিশ্চিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাকে ফিরিশ্‌তা ও মালাক বলিয়াও তা'বীর করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় দরজা যাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি তাহা হইল এই যে, যখন দুইটি প্রেম একত্রিত হয় তখন আল্লাহ্‌র প্রেমের আগুন মানুষের হৃদয়কে এতটা উত্তপ্ত করে যে, ইহাতে আগুনের মত একটি চমক পয়দা হয়। কিন্তু এই চমকের কোন প্রকার উত্তেজনা বা বিস্ফোরণ ঘটে না। শুধু একটি চমক যাহাকে 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মা নামে অভিহত করা যায়।

তৃতীয় দরজা হইল এই যে, আল্লাহ্‌তাআলার মহব্বতের একটি নেহায়েৎ জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ মানুষের মহব্বতের সামর্থ্যপূর্ণ পাত্রের মধ্যে পড়িয়া ইহাকে প্রজ্জ্বলিত করে, এবং তাহার সমস্ত শিরা-ধমনী এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তুমুলভাবে আন্দোলিত করে এবং সেই রূহানী মানুষটি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) বিকাশের পরিপূর্ণতম এবং উৎকৃষ্টতম বিকাশস্থল হইয়া যায় এবং এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্য

প্রেম মানুষের হৃদয়ের ফলকে শুধু ধরাই পড়ে না বরং সেখানে এক চমক সৃষ্টি করে; তাহাই নহে সাথে সাথে এই চমকের ফলে তাহার সমস্ত সত্তাই আন্দোলিত হয় এবং তাহার অগ্নিশিখা এবং রশ্মি আশে পাশের সবাইকে দিবালোকের মত আলোকিত করিয়া তোলে; এবং কোন প্রকারের অন্ধকার বাকী থাকে না; এবং পুরাপুরিভাবে এবং সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলীর আধারে পরিণত হয় সেই ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি সত্তা যেন সবটাই শুধু আগুনই আগুন হইয়া যায়, আর এই যে অবস্থা যাহা দুই মহব্বতের মিলনের ফলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় সৃষ্টি হয় ইহার নাম রূহুল আমীন (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত রূহ)। কেননা, ইহা সর্বপ্রকার অন্ধকার হইতে নিরাপত্তা দেয়, এবং সর্বপ্রকার ময়লা-ধূলিবালি হইতে পবিত্র, এবং কঠিনতম শক্তি বলিয়াও ইহার এক নাম রাখা হয়। কেননা, ইহা সেই সর্ব্বোচ্চ দরজার শক্তি যাহার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ওহী কল্পনাও করা যায় না এবং ইহার আর এক নাম যুল ওফুকেল আ'লা রাখা হয়। অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তের মালিক। কেননা, ইহা ওহী ইলাহীর চরম পর্যায়ের ঐশী বিকাশ এবং ইহাকে রা'য়া মা রা'য়া (তিনি যাহা দেখিবার ছিল তাহা দেখিয়াছেন) নামেও নামকরণ করা হয়। কেননা, ইহার আন্দাজ করা সমস্ত সৃষ্টির চিন্তা ও কল্পনারও বাহিরে। এবং এই আধ্যাত্মিক মর্যাদা শুধু পৃথিবীতে একজন মানুষই লাভ করিয়াছেন আর তিনি হইতেছেন ইনসানে কামেল– যাহাতে আসিয়া মানবতার সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে– এবং তিনি মানবতার যত ক্ষমতা-প্রতিভা আছে উহার উৎকর্ষ সাধনের চরম শিখরে পৌঁছিয়াছেন। এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সৃষ্টির যে অর্ধবৃত্ত উহার উপরিভাগের সর্বশেষ জ্যা বা ব্যাস যাহা চরিত্রের গুণাবলীর বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিন্দুসমূহ ধারণ করে। ইহাই সর্ব প্রকারের মর্যাদাসমূহের চরম ও পরম বিকাশস্থল। আল্লাহ্‌তাআলার প্রজ্ঞার হাত একেবারে ছোট হইতে ছোট এবং নীচ হইতে নীচ পর্যায়ের মানুষ সৃষ্টি করিয়া উহাকে উন্নতি দান করিতে করিতে উন্নতির সর্বশেষ বিন্দুতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন– যাঁহার নাম অন্য কথায় মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম– যাহার অর্থ হইতেছে অনেক প্রশংসার অধিকারী। অর্থাৎ পরিপূর্ণতার চরম বিকাশ। সুতরাং স্বভাবের দিক দিয়া যেমন এই নবীর সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চতর উন্নততর মর্যাদা ছিল তেমনিভাবে বাহ্যিক দিক দিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্বোন্নত মর্যাদার ওহী দান করা হইয়াছে এবং সর্বোচ্চ স্তরের এবং গুণগত মানে সব চাইতে উন্নততর প্রেম তিনি লাভ করেন। ইহা সেই সুউচ্চ মর্যাদা যেখান পর্যন্ত আমি এবং মসীহ্ পৌঁছিতে পারি নাই এবং পারিবও না। ইহার নাম দুইয়ের মিলনের স্থল এবং পরিপূর্ণভাবে প্রেমিক ও প্রেমিকাদের মধ্যে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া। পূর্ববর্তী নবীগণ যাহারা আঁ হযরত (সঃ)-এর আগমনের খবর দিয়াছিলেন এই ঠিকানার এবং নিশানেরই খবর দিয়াছিলেন, তাহারা এই মার্গের দিকেই ইশারা করিয়াছিলেন এবং মসীহ্ এবং এই অধমের যে মার্গ উহাকে পুত্রের মর্যাদা হিসাবে অভিসিক্ত করা যায়। রূপকভাবে ব্যাখা করিলে পরে তেমনিভাবে এই মহা মর্যাদাপূর্ণ মার্গের কথা বলিতে গিয়া পূর্ববর্তী নবীগণ এই নবীর আগমনকে রূপকের ভাষায় স্বয়ং খোদার আগমন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মর্যাদা সম্বলিত এই মার্গের অধিকারী বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে রূপকের ভাষায় খোদা বলিয়াছেন। যেমনভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আঙ্গুর বাগানের ফল আহরণ করার জন্য বাগানের মালিক (যিনি খোদাতাআলা) প্রথম চাকরদের পাঠাইয়াছিলেন – অর্থাৎ প্রথম স্তরের নৈকট্য লাভকারী পুণ্যবান বান্দাগণ যাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে এবং ঐ শতাব্দীতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কিছু আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বাগানের মালী যখন ফসল দিতে অস্বীকার করিল তখন বাগানের মালিক তাকিদ করার জন্য তাঁহার পুত্রকে পাঠাইলেন যেন তাহারা তাহাকে ছেলে মনে করিয়া বাগানের ফল তাহার হাওলা করিয়া দেয়। এখানে পুত্র বলিতে হযরত মসীহ (আঃ)-কে বুঝাইয়াছে। কেননা, নৈকট্যের এবং ভালবাসার দ্বিতীয় মার্গ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মালীগণ ঐ পুত্রকেও ফল দিতে অস্বীকার করিল বরং নিজেদের ধারণা অনুসারে তাহাকে কতল করিয়া ফেলিল। ইহার পরে হযরত মসীহ্ বলিতেছেন যে, এখন বাগানের মালিক স্বয়ং আসিবেন অর্থাৎ খোদাতাআলা নিজেই জাহির হইবেন যেন মালীদের কতল করিয়া বাগান এই ধরনের লোকের কাছে সোপর্দ করেন যেন তাহারা ঠিক সময়মত ফল দেয়। এখানে খোদাতাআলার আগমন দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর আগমন বুঝাইয়াছে। কেননা, মুহাম্মদ (সঃ) নৈকট্য এবং প্রেমের তৃতীয় স্তর* লাভ করিয়াছেন। কেননা, ইহারা হইল সব আধ্যাত্মিক মর্যাদা।

যাহাদিগকে রূপক হিসাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বাহ্যিক রূপ দান করা হইয়াছে।

হে পাহলোয়ান তুমি প্রতাপ ও বীর্যের সহিত তোমার অসি কোষে ভরিয়া তোমার কোমরে লটকাইয়া রাখ। দায়িত্বশীলতা, বিনয়, এবং ন্যায়-বিচার-এর ঘোড়ায় চড়িয়া তোমার বুযর্গী তুমি প্রকাশ করিবে এবং কৃতকার্যতা তোমার পদচুম্বন করিবে; তোমার দক্ষিণ হস্ত ভয়ংকর কার্যসমূহ সম্পাদন করতঃ তোমার প্রতাপ প্রকাশ করিবে। বাদশাহের দুশমনের অন্তর তোমার তীর বিদীর্ণ করিবে। মানুষ তোমার সম্মুখে নত হইবে। হে খোদা! তোমার সিংহাসন চিরকাল স্থায়ী হইবে। তোমার রাজদন্ড ন্যায়দন্ডে পরিণত হইবে। তুমি সত্যবাদিতার সাথে বন্ধুত্ব করিয়াছ এবং অসত্যের সাথে শত্রুতা করিয়াছ, তাই খোদা, যিনি তোমার খোদা খুশীর সুগন্ধ দ্বারা তোমাকে তোমার সাথীগণের চাইতে বেশী সুবাসিত করিয়াছেন *(দেখুন যবুর - ৪৫)।*

এখন এই কথা জানা দরকার যে, যবুরের এই বাক্যাংশ– হে খোদা তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে। তোমার রাজদন্ড ন্যায়দন্ডে পরিণত হইবে– ইহা শুধু একটি রূপক মাত্র। যাহার উদ্দেশ্য হইল এই যে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া শানে মুহাম্মদীর মাত্রা নির্ধারণ করা। তারপর ঈসায়া নবীর কিতাবেও এই ধরনের কথাই লিখা আছে। অনন্তর উহার এবরাত এইরূপ– (চলবে)

অনুবাদ - **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**

আমাদের সাইয়্যেদ ও মওলা জনাবে মুকাদ্দস খাতামুল আম্বিয়া (সঃ)-এর সম্পর্কে শুধু মসীহ্ই বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর দুনিয়াতে আগমন প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার স্বয়ং পৃথিবীতে জাহির হওয়া। বরং আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্পর্কে এই ধরনের শব্দ অন্যান্য নবীগণও ব্যবহার করিয়াছেন যাহারা তাঁহার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এবং রূপকের ভাষায় আঁ হযরত (সঃ)-এর শুভাগমনকে খোদাতাআলার আগমন বলিয়াই আখ্যায়িত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং যেহেতু তিনি গুণাবলীতে খোদাতাআলার বিকাশের পরিপূর্ণতমস্থল তাই তাহাকে খোদা বলিয়াও তাহারা ডাকিয়াছেন। অনন্তর আমরা হযরত দায়ুদ-এর যবুরে দেখিতে পাই যে, লিখা আছে, তুমি সৌন্দর্যে মানব সন্তান হইতে বহুগুণ উর্ধ্বে। তোমার রসনায় বহু নেয়ামত স্থাপিত হইয়াছে। তাই খোদা তোমাকে চিরকাল কল্যাণমন্ডিত করিয়াছেন। (অর্থাৎ তুমি খাতামুল আম্বিয়া হইয়াছ)।

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)

(পঞ্চম কিস্তি)

সত্যিকারের পুত্র হওয়া এখানে বুঝান হয় নাই অথবা সত্যিকারের ঈশ্বরত্বও এখানে আরোপ করা হয় নাই।*

এখানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাহা কিছু আমরা রূহুল কুদুস এবং রূহুল আমীন ইত্যাদি সম্পর্কে তা'বীর করিয়াছি ঐগুলি ঐ সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাস যাহা মুসলমানগণ পোষণ করেন তাহার বিপরীত নহে। কেননা, মুসলমানগণ কখনই এই ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, ফিরিশ্‌তাগণ ব্যক্তি সত্তার দ্বারা পায়ে চলিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসেন এবং এই ধরনের খেয়াল আসলে বাতিলও বটে। কেননা, যদি ইহা জরুরী হইত যে, ফিরিশ্‌তাগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেদের আসল অস্তিত্ব সহকারে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেন তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালাকুল মওত ফিরিশ্‌তা (যিনি মৃত্যু দান করিয়া থাকেন) তিনি এক সেকেন্ডের মধ্যে এ ধরনের হাজার হাজার লোকের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন যে সমস্ত লোকেরা পরস্পর একজন হইতে আর একজন হাজার হাজার ক্রোশ দূরে বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেন। যদি ইহার প্রয়োজন হয় যে, তিনি নিজের পায়ে হাঁটিয়া ঐ সমস্ত শহরে তাহাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিবেন তাহা হইলে এক সেকেন্ডে কেন কয়েক মাস সময়েও তাহার পক্ষে এই কাজ করার জন্য যথেষ্ট হইবে না। ইহা কি সম্ভব যে, এক ব্যক্তি চক্ষের পলকে অথবা ইহা হইতেও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবেন। না ইহা সম্ভব কখনও হইতে পারে না। বরং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থান হইতে এক বিন্দু পরিমাণও নড়া চড়া করেন না, আগে পিছে সরেন না। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন,

ওমা মিন্না ইল্লালাহু মাকামুম্ মা'লুম।
ওয়া ইন্না লানাহনুস সাফ্‌ফুন। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৬৫-১৬৬)

অর্থাৎ (তাহারা বলে) " আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য অবশ্যই এক নির্ধারিত স্থান আছে। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্‌র সমীপে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর আসল কথা হইতেছে এই যে, যেমন সূর্য নিজের স্থানে অবস্থান করিতেছে এবং তাহার আলো সমস্ত জগতের উপরে পড়িয়া নিজের ধর্ম অনুসারে সমস্ত জগতকে আলোকিত এবং উত্তপ্ত করিতেছে এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে কল্যাণ পৌঁছাইতেছে। তেমনিভাবে রূহানীয়্যতের আকাশ-উহাকে গ্রীকদের ধারণানুযায়ী আকাশের ভ্রাম্যমান জীবাত্মা বল বা দাসাতীর এবং বেদের পরিভাষায় অনুসারে তাহাদেরকে তারকারাজির আত্মা বলিয়া আখ্যা দাও, অথবা নেহায়েৎ সাদাসিদা এবং তৌহীদের পূজারীদের মতানুসারে তাহাদিগকে মালায়েকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা বলিয়া আখ্যায়িত কর** এখানে এই কথা উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাহাকিছু রূহুল কুদুস এবং রূহুল আমীন ইত্যাদির তা'বীর করা হইয়াছে- তাহা ঐ সমস্ত আকীদার উপরে নির্ভরশীল যাহা মুসলমানেরা বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে এবং ঐ আকীদার পরিপন্থী নহে। কেননা, ইসলামের সত্যানুসন্ধানকারীগণ ইহা মনে করেননা যে, যে ফিরিশ্‌তাগণ মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিজের পায়ে ভর করিয়া চলাফেরা করে; এবং এই ধরনের ধারণা গ্রহণীয় নহে। কেননা, ইহা যদি জরুরী হইত যে, ফিরিশ্‌তারা নিজের নিজের কাজের জন্য স্বকীয় সত্তায় পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেন তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালাকুল মওত যিনি এক সেকেন্ডে হাজার হাজার লোকের জান কবজ করিয়া থাকেন যে সমস্ত লোকেরা বিভিন্ন শহরের বাসিন্দা এবং যাহারা হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে থাকে তাহাদের নিকট পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া একই সময়ে কীভাবে সম্ভবপর হইতে পারে। যদি হাঁটিয়া যায় এক শহর হইতে আর এক শহরে, এক গ্রাম হইতে আরেক গ্রামে, এক বাড়ী হইতে আরেক বাড়ীতে তবে তো এক সেকেণ্ডের কাজ করিতে কয়েক মাস লাগিবে। ইহা কি সম্ভবপর যে, এক ব্যক্তি মানুষের মত চলাফেরা করিয়া চোখের নিমিষে অথবা আর কম সময়ে সারা দুনিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে? অসম্ভব। কখনও না। প্রকৃতপক্ষে এই অদ্ভুত সৃষ্টি স্ব স্ব জায়গায় অবস্থান করে এবং

---

* দেখ আমার বান্দা যাহাকে আমি শামলাইব ; আমার সেই বরগুজিদা বান্দা যাহার উপরে আমি সন্তুষ্ট, আমি তাহার উপরে আমার রূহ স্থাপন করিয়াছি। সে জাতিসমূহের উপরে সত্যকে প্রকাশিত করিবে। সে চিৎকার করিবে না এবং তাহার আওয়াজ উঁচু করিবে না এবং বাজারে বন্দরে স্লোগান দিবে না। তিনি মলন দেওয়া তৃণ খণ্ডকেও ভাঙ্গিবেন না এবং শনের আগুন (যাহা আস্তে আস্তে গোপনে গোপনে জ্বলে) যাহা হইতে ধূয়া ওঠে উহাকে নির্বাপিত করিবেন না। তিনি ক্লান্তও হইবেন না পরিশ্রান্তও হইবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সত্য মত ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং শান্তিকে নিশ্চিত করিবেন। এবং উপদ্বীপগুলি তাহার হেদায়াতের জন্য অপেক্ষায় থাকিবে...খোদাওন্দ খোদা এক সাহসী ব্যক্তির ন্যায় বহির্গত হইবেন। তিনি যোদ্ধার মত স্বীয় আত্মমর্যাদায় উদ্বেলিত হইবেন।

এখন জানিতে হইবে যে, এই বাক্যাংশ "খোদাওন্দ খোদা এক সাহসী ব্যক্তির ন্যায় বহির্গত হইবেন"- ইহাও একটি রূপক। ইহা রূপকভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতাপপূর্ণ আগমনের কথা প্রকাশ করিতেছে। দেখুন ইসায়া নবীর কিতাব ৪২ অধ্যায়। আর এমনিভাবে বহু নবী এই ধরনের বাক্য রসূলে করীম (সঃ)-এর মর্যাদা প্রসঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু এই সব কথা লিখিতে হইলে এই টীকা দীর্ঘ হইয়া যাইবে তাই বাস্তবতার খাতিরে এখানেই শেষ করিতেছি। এবং আমি যে তিনটি রূহানী মর্যাদার কথা বর্ণনা করিয়া তৃতীয় মর্যাদাটি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য নির্ধারণ করিয়াছি ইহা আমার তরফ হইতে গবেষণার ফসল নহে বরং এলহামীভাবে খোদাতাআলা ইহা আমার উপরে প্রকাশ করিয়াছেন।

** ফিরিশতাগণকে এই অর্থে ফিরিশ্‌তা বলা হয় যে, তাহারা আকাশমালায় যে সব বস্তু অণুপরমাণু তাহাদের ফিরিশতা এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত জীব জানোয়ার আছে তাহাদের ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ তাহাদের স্থিতি এবং স্থায়িত্বের জন্য তাহারা রূহের মত কাজ করে। এবং ইহা ছাড়া এই অর্থেও ফিরিশ্‌তা যে তাহারা দূত হিসাবে কাজ করে। এই সমস্ত কথা লিখিতে গেলে, বিবরণ অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে তাই এখানেই কার্যতঃ সীমাবদ্ধ রাখিতেছে। এবং আমি এই জায়গায় ঐশী-প্রেম এবং নৈকট্যের তিনটি স্তর বর্ণনা করিয়াছি এবং তৃতীয় মর্তবা যাহা সর্বোচ্চ স্তর রূহানীয়্যতের আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্য নির্ধারণ করিয়াছি। ইহা আমার তরফ হইতে ইজতেহাদ নহে বরং খোদাতাআলা ইলহাম দ্বারা ইহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।

নিজেদের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে। এবং খোদাতাআলার কামেল হিকমত অনুসারে জমিনের প্রতিটি বস্তু যাহার মধ্যে যোগ্যতা আছে তাহাকে তাহার পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিকাশের মাধ্যমে গন্তব্য স্থলে পৌঁছোবার জন্য সাহায্য করে। তাহারা আধ্যাত্মিক সেবায় নিযুক্ত আছে। এই সেবা বা রূহানী খেদমত জাহেরী খেদমতও হইতে পারে অথবা বাতেনী খেদমতও হইতে পারে। যেমন, আমাদের শরীর এবং আমাদের সমস্ত বাহ্যিক শক্তি নিশ্চয়ের উপর চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তেমনিভাবে আমাদের অন্তর এবং মস্তিষ্ক এবং আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর এ সমস্ত ফিরিশ্‌তারা (আমাদের বিভিন্ন শক্তি সামর্থ্যানুসারে) তাহাদের নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যেই বস্তু কোন ভাল মণি-মুক্তা হওয়ার ক্ষমতা রাখে তাহার উপরে তাহারা সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যদিও তাহা মাটির একটি টুকরাই হউক না কেন অথবা পানির একটি বিন্দুই হউক না কেন, তাহা তাহার পিতার শুক্রস্থলীর মধ্যে থাকুক অথবা তাহার মায়ের জড়ায়ুর ভিতরেই পড়ুক না কেন–উহা ঐ মালায়েক উল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণের রূহানী তরবীয়্যতের মাধ্যমে লাল, আলমাস এবং ইয়াকুত, নীলাম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান মনি-মুক্তার মত মন ও মস্তিষ্কের মানুষে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। দাসাতীর যাহাকে মাজুসীরা (তারকাউপাসকগণ) ইলহামী কিতাব বলিয়া মনে করে-যাহার আগমনের বয়স তাহারা নির্ধারণ করে, বেদের আগমনের বয়স উহার এক কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। অর্থাৎ বেদের আগমনের বয়স ত এক অর্বুদ ছাপ্পান্ন কোটি বছর তো শুধু অন্যদের আন্দাজ অনুমানের উপরে বলা হইয়া থাকে, কিন্তু দাসাতীর সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে ইহার আগমনের বয়স হইল এক শংখ বৎসরেরও কিছু বেশী। এবং ইহা দাসাতীরেই লিখা আছে। বরং ইহাতো আমি ভয়ে ভয়ে বলিয়াছি, তাহা না হইলে সেখানে শংখের পরেও আরো তিনটি শূন্য দেওয়া আছে। এই কিতাব এই বস্তু নিশ্চয় যাহারা তারকারাজি ও আকাশমালাতে আছে তাহাদের শুধু রূহানী প্রভাবকেই স্বীকার করে। তেমনিভাবে বেদ ও ইহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথাই বলে না, এবং উহাদিগকে মধ্যবর্তী যোজক হিসাবেই পেশ করে না, এবং মধ্যবর্তী সেবক হিসাবেই মূল্যায়ন করে না, বরং বিভিন্ন স্থানে তাহাদের স্তুতি ও মহিমা গাহিয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তু লাভ করার জন্য তাহাদের ইবাদত করার কথা বলে, এবং হইতে পারে যে, পরবর্তী কালের সংশোধন ও পরিমার্জনের ফলে এই কিতাবগুলিতে এই কুফুরীপূর্ণ তালীম ঢুকিয়া পড়িয়াছে। যেমন বেদে এই ধরনের আরো অনেক উল্টা-পাল্টা কথা-বার্তা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শিক্ষা যে, এই পৃথিবীর কোন সৃষ্টি-কর্তা নাই, এবং প্রত্যেক জিনিস তাহার নিজ মৌলিক উপাদানে চিরজীবী এবং অবশ্যই চিরস্থায়ী এবং চিরপুরাতন এবং নিজের অস্তিত্বের নিজেই সৃষ্টিকর্তা, অথবা এই শিক্ষা কোন পুনর্জন্মে ও জন্মান্তরের অশুভ চক্র হইতে বাহির হইয়া আসার কোনভাবেই কোন সময়েই সম্ভব নয়–মুক্তি লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। অথবা এই শিক্ষা যে, কোন স্বামীওয়ালা স্ত্রী পুরুষ সন্তান না হওয়ার কারণে অন্য পুরুষের অংকশায়িনী হইতে পারে যেন ঐ পুরুষ হইতে সে পুত্রবতী হইতে পারে। অথবা এই শিক্ষা যে, বড় বড় বুযুর্গ তাহারা বেদের ঋষিই হউন না কেন যাহাদের উপর চারিটি বেদ নাযেল হইয়াছে চিরকালের জন্য মুক্তি কিছুতেই পাইতে পারে না। আর তাহারা কিছুতেই সর্বকালের জন্য অবশ্য অবশ্যই সম্মানের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং সম্মানের সাথে স্মরণযোগ্য হইতে পারে না; বরং ইহার সম্ভাবনা আছে যে, অন্যান্য জানোয়ারের মত জন্মান্তরের চক্করে পড়িয়া এটা সেটা ওটা যে কোন ধরনের জানোয়ারে পরিণত হইতে পারে। বরং হয়ত হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের ধারণা মতে কোন মানুষ সে অবতাগণের মর্যাদা সম্পন্নই হউক না কেন অথবা বেদের ঋষিগণের চেয়েও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হউক না কেন পোকা-মাকড় ইত্যাদি অথবা যে কোন বন্য জানোয়ারে পরিণত হইতে পারে বরং পারে নহে হওয়াটাই সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত অগ্রহণযোগ্য শিক্ষা যাহা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নীচ চিন্তাধারার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং যেসমস্ত লোকেরা নিজেদের মত মানবজাতির জন্য, শুধু তাহাই নহে বরং নিজেদের বুযর্গদের জন্য এই ধরনের জন্মান্তর জায়েয রাখিয়াছে; তাহারা এটাও জায়েয রাখিয়াছে যে, তারকাসমূহ হইতে নিজেদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য দোয়া করা ও তাহাদের পূজা করা জায়েয, যেমন খোদাতাআলার ইবাদত করা হয়। কিন্তু কুরআন করীম যাহা সর্বপ্রকারে তৌহীদ (একত্ববাদ) এবং (সভ্যতার) রাস্তা খুলিয়া দেয়- কুরআন ইহা জায়েয রাখে নাই যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁহার কোন সৃষ্টির পূজা করা হউক; অথবা তাহার রবুবীয়্যতের কুদরত শুধু নাকারা এবং দুর্বলভাবে স্বীকার করা হউক; এবং তাঁহাকে প্রত্যেক জিনিষের প্রারম্ভ এবং উৎপত্তিস্থল মনে না করা হউক; অথবা কোন লজ্জাহীন কাজ নিজেদের সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হউক। (চলবে)

অনুবাদ – **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)

(ষষ্ঠ কিস্তি)

এখন আমি আবার ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। কুরআন শরীফ যেভাবে ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছে তাহা একেবারেই সরল সহজ এবং মানুষের চিন্তা শক্তির জন্য সহজ কল্পনীয় এবং ইহা মানা ছাড়া মানুষের কোন গতি নাই। কুরআন শরীফের উপরে গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহা বুঝা যায় যে, মানুষের জাহেরী ও বাতেনী তরবীয়তের জন্য কিছু মাধ্যম প্রয়োজন এবং কুরআন শরীফের কোন কোন ইশারা হইতে ইহা নেহায়েৎ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কতক পবিত্র আত্মা যাহাদেরকে ফিরিশ্‌তা নামে অভিহিত করা হয় তাহারা আসমানের বিভিন্ন স্তরের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত। কতক তাহাদের বিশেষ প্রভাব দ্বারা বায়ুকে প্রবাহিত করিয়া থাকেন এবং কতক ফিরিশ্‌তা বৃষ্টি বর্ষণ করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্যান্য প্রভাব ফেলিয়া থাকেন পৃথিবীতে। সুতরাং এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, যেহেতু নূরের সাথে সামঞ্জস্য আছে, নূরের সেই সমস্ত পবিত্র সত্তার ঐ সমস্ত আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলির সাথেও সম্পর্ক থাকিতে পারে যাহারা আসমানে বিচরণ করে। কিন্তু এই সম্পর্ককে এমন মনে করা উচিত নহে যেমন পৃথিবীর মধ্যে বিচরণকারী প্রাণীসমূহের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। বরং সেই পবিত্র সত্তাগুলির যেহেতু আলোর সাথে সামঞ্জস্য আছে এবং ঐশী আলোকে আলোকিত তাই রূহানীভাবে সেই তারকাগুলির সাথে তাহাদের এক রূপকভাবে গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান; এবং সেই সম্পর্ক এতই শক্তিশালী যে, সেই পবিত্র সত্তাগুলিকে (নুফুসে তাইয়্যেবাহ্‌কে) যদি সেই তারকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত শক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইবে, ঐ সত্তাগুলি গোপন হস্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ তারকাগুলি নিজেদের কার্যক্রম পরিচালিত করিতেছে; এবং যেভাবে খোদাতাআলা তামাম আলমের প্রাণ হিসাবে কাজ করেন তাহারাও তদ্রূপ (তবে এখানে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বুঝানো হয় নাই) ঐ পবিত্র আলোকময় সত্তাগুলি গ্রহ নক্ষত্রগুলির প্রাণের মতই কাজ করে; এবং যদি তাহারা আলাদা হইয়া যায় তাহা হইলে গ্রহগুলির কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। ইহা অত্যাবশকীয় এবং অবশ্যম্ভাবী। এবং আজ পর্যন্ত কেহ এই ব্যাপারে মতভেদ করে নাই যে, যতগুলি গ্রহ এবং নক্ষত্র আকাশে বিচরণ করিতেছে তাহারা ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুনিচয়ের বৃদ্ধি, পরিপক্কতা এবং পরিবর্ধনের জন্য সদা সর্বদাই কাজ করিয়া যাইতেছে। মোট কথা ইহা একেবারে অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষিত সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত নাবাতাত (তরু-লতা) এবং জামাদাত (বস্তুসমূহ) এবং হায়ওয়ানাত (প্রাণীজগৎ) এর উপরে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব দিনরাত পড়িতেছে এবং মূর্খ হইতে মূর্খ লোকও এই ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে যে, চাঁদের আলো ফলসমূহকে পুষ্ট হইতে সাহায্য করে এবং সূর্যের আলো উহাদের পাকাইবার জন্য এবং মিষ্ট করিবার জন্য সাহায্য করে। এবং কোন কোন বায়ু প্রবাহ বাহ্যতঃ বেশী ফলনের জন্য দায়ী। এখন দেখা যাইতেছে, এই পৃথিবীর বাহ্যিক যে প্রাকৃতিক নিয়ম তাহাতে ইহারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাদের ফলনের এবং বৃদ্ধির মধ্যে; তাহা হইলে ইহাতে সন্দেহ করার কি কারণ থাকিতে পারে যে, বাতেনী সিলসিলাতেও তাহারা তরবীয়তের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জ্যোতির্ময় আত্মাগুলির যাহাদের সাথে সম্পর্ক আছে এই সমস্ত নফসে তাইয়্যেবাহ্‌র যেমনভাবে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক আছে। (চলবে)

– অনুবাদঃ ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া

তৌযীহে মরাম
(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)
(৭ম কিস্তি)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)

এখন ইহার পরে ইহাও জানা আবশ্যক যে, যদিও বাহ্যিকভাবে ইহা আদবের খেলাফ মনে করা হয় যে, খোদা এবং পবিত্র সত্তাগণের মধ্যে তাঁহার নূর পৌঁছাইবার জন্য কোন ওয়াস্তা বা মাধ্যমের প্রয়োজন; কিন্তু একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিলে ইহা বুঝা যাইবে ইহার মধ্যে বেয়াদবীর কোন কিছু নাই, বরং ইহা সরাসরি আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়মের অধীন যাহা আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসের ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং অনুভব করিয়া থাকি। কেননা, আমরা দেখিতে পাই যে, নবীনগণও জাহেরীভাবে তাহাদের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে নির্ভরশীল যেভাবে আমরা নির্ভরশীল এবং এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারে তাহারাও বাহ্যিক কিছু মাধ্যম ব্যবহারে বাধ্য। এবং নবীর চক্ষুও যদিও উহা যতই জ্যোতির্ময় এবং কল্যাণমন্ডিত চক্ষুই হউক না কেন সূর্যের কিরণ ছাড়া বা সূর্যের স্থলবর্তী অন্য কোন আলোক বর্তিকার আলোর মাধ্যম ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না;এবং বায়ুর মাধ্যম ছাড়া নবীগণও কিছুই শুনিতে পান না। সুতরাং এই কথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, নবীর রূহানীয়তের উপরও এই গ্রহ-নক্ষত্রের নুফুসে নূরানীয়া (আলোকিত সত্তানিচয়)-এর প্রভাব অবশ্যই পড়িয়া থাকে; বরং সবচেয়ে বেশী (প্রভাব) পড়িয়া থাকে। কেননা, যে ধরনের ক্ষমতা স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তেমনিভাবে প্রভাবও স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণভাবেই পড়িয়া থাকে। কুরআন শরীফ হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কগুলি প্রত্যেকের নিজেদের বাহ্যিক আবরণের ভিতরে এক একটি আত্মা বা রূহ রাখিয়া থাকে যাহাদেরকে আমরা নুফুসে কাওয়াকেব (বা জ্যোতিষ্কের আত্মা) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, এবং যেভাবে গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলির মধ্যে তাহাদের উপরের আবরণ অনুসারে বিভিন্ন গুণাবলী বিরাজিত এবং তাহারা পৃথিবীর উপরে অবস্থিত প্রত্যেকটি জিনিসের উপরে নিজেদের শক্তি অনুসারে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; তেমনিভাবে তাহাদের নুফুসে নূরানিয়া (আলোকময় সত্তা নিয়ে) ও বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের উপর আল্লাহ্‌তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন বাতেনী প্রভাব ফেলিয়া থাকে। এবং এই নুফুসে নূরানীয়া (আলোকময় সত্তা নিয়ে) সিদ্ধ পুরুষদের উপর রীতিমত বাহ্যিক রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং মানুষের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের কাছে ধরা দেয়। এবং এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বর্ণনা শুধু বর্ণনার খাতিরেই নহে, বরং ইহা সেই সত্য যাহা অবশ্যই প্রভাব ও সত্যের অন্বেষণকারীকে মানিতে হইবে। কেননা, যখন আমাদেরকে এই কথা মানিতে হয় যে, পৃথিবীর যত সৃষ্ট বস্তুনিচয় তাহাদিগকে তরবীয়তের কাজে লাগিয়াছে আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহ তখন এবং যখন আমরা গভীর মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করি তখন দেখিতে পাই যে, অবশ্য অবশ্যই আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি মাটির পৃথিবীর উপর প্রতিটি জিনিসের উপরে নিজেদের প্রভাব ফেলিতেছে–উহা গাছ-পালা, তরু-লতা, জীবজগৎ, প্রাণীজগৎ সবার উপরে। সুতরাং এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষের রূহানী তরক্কীর ব্যাপারে যেখানেই মানুষের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ও সেই আকাশের নুফুসে নূরানীয়া (আলোকময় সত্তা নিয়ে) অবশ্য অবশ্যই তাহাদের জ্যোতির্ময় প্রভাব ফেলিয়া থাকে– ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। এই প্রভাবের কারণে গভীর তত্ত্বপূর্ণ এই শরীয়তে রূপকভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলদের মধ্যে ফিরিশ্‌তাগণকে মাধ্যম হিসাবে অবস্থিত থাকাকে একটি জরুরী বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। তাহাদের উপর ঈমান আনা ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। যে সমস্ত লোক নিজেদের ঘৃণ্য মূর্খতার কারণে এই দর্শনকে বুঝিতে পারে নাই– যেমন আর্য সমাজী এবং ব্রাহ্ম সমাজীরা। তাহারা জলদি করিয়া তাহাদের অকারণ কার্পণ্য এবং বিদ্বেষের কারণে যাহা তাহাদের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে কুরআনের শিক্ষার উপরে এই অভিযোগ করিয়াছে যে, কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে ফিরিশ্‌তাগণকে মাধ্যম বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছে জরুরী মনে করিয়া এবং এই কথাটি বুঝে নাই যে, খোদাতাআলার তরবীয়তের সাধারণ নিয়ম ইহাই যাহা পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুদের ঋষিগণ যাহাদের উপরে হিন্দুদের বিশ্বাস যে, বেদের চারিটি অংশ তাহাদের উপরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা কি তাহাদের দৈহিক শক্তিগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণে আসমানী জ্যোতিষ্কগুলির প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইতেন না? তাহারা কি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে শুধু চোখের জ্যোতির সাহায্যেই দেখিতে পাইতেন? অথবা বাতাসের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের কর্ণসমূহ দ্বারা শুনিতে পাইতেন? ইহার জবাব অবশ্যই ইহাই হইবে না, কখনও না। তাহারাও আকাশের জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহের তরবীয়ত এবং তকমিল (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং পূর্ণ বিকাশের) মুখাপেক্ষী ছিলেন। হিন্দুদের বেদগুলি এই ফিরিশ্‌তাদের কোথায় অস্বীকার করিয়াছে? বরং তাহারা তো এই মাধ্যমগুলিকে মান্য করা এবং তাহাদের কদর করার মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি করিয়াছে। এতদূর আগাইয়া গিয়াছে যে, তাহারা খোদাতাআলার দরজা এবং এই ফিরিশ্‌তাদের দরজা বরাবর করিয়া ফেলিয়াছে। এক ঋগবেদের উপরেই দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া দেখ যে, উহাতে কি পরিমাণ আকাশের জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহের এবং উপকরণসমূহের পূজা-অর্চনা বিদ্যমান আছে এবং কীভাবে তাহাদের স্তুতি এবং মহিমা এবং প্রশংসা এবং গুণগানে পাতার পর পাতা কলংকিত করা হইয়াছে। এবং কি ধরনের বিনয় এবং ব্যাকুলতার সাথে তাহাদের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে– যাহা কবুলও হয় নাই। কিন্তু কুরআনের শরীয়ত তো এই রকম কাজ করে নাই। বরং ঐ আলোকময় সত্তাগুলিকে যাহারা আকাশের বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক রাখে, অণু-পরমাণু অথবা ধূম্রকুন্ডলীগুলির সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ ধরনের সম্পর্ক যেমন শরীরের সাথে মানুষের আত্মার সম্পর্ক– ইহাদিগকে শুধু ফিরিশ্‌তা বা জিন নামে অভিহিত করিয়াছে কুরআনী শরীয়ত। এবং ঐ নূরানী ফিরিশ্‌তাদিগকে, যাহাদের অবস্থান আলোকময় নক্ষত্র ও তারকারাজি এবং ছায়াপথগুলির মধ্যে। নিজেদের পবিত্র সত্তায় এবং তাহার রসূলগণের মধ্যে এই ধরনের সংজ্ঞায়-সংজ্ঞায়িত করেন নাই যে, তাহারা স্বাধীন এবং স্বকীয় ক্ষমতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন; বরং তাহাদের সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা হইয়াছে যে, তাহারা এক নির্জীব বস্তু যাহা অন্য একজনের হাতে ন্যস্ত আছে যাহা দ্বারা তিনি যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন, যেভাবে খুশী কাজ নিতে পারেন। ইহারই উপরে ভিত্তি করিয়া সমস্ত বস্তুর অণু-পরমাণুগুলিকে ফিরিশ্‌তা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে কুরআন শরীফের কোন কোন জায়গাতে। কেননা, ঐ সমস্ত অণু-পরমাণু তাহাদের প্রভু-প্রতিপালকের আওয়াজ শুনিতে পায়, এবং ইহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের শরীরের ভিতরে স্বাস্থ্যের দিকে অথবা রোগ ব্যাধির দিকে যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা এইভাবেই হয় যে, ঐ সমস্ত অণু-পরমাণু কাজ করে যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আদেশ দেওয়া হয়, তাহারা অগ্রসর হয় অথবা পিছাইয়া যায়, তাহারা খোদাতাআলার প্রত্যাশা অনুযায়ী অগ্রে পশ্চাতে পদক্ষেপ করে। (চলবে)

অনুবাদঃ ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(অষ্টম কিস্তি)

এখন একটু চক্ষু মেলিয়া দেখা দরকার যে, এই ধরনের মাধ্যম যাহাদের কথা কুরআন শরীফে লিখা আছে তাহাদিগকে মান্য করিলে কি ধরনের শির্‌ক হইতে পারে, এবং খোদাতাআলার কুদরতের শানে কোন ফরক আসে কিনা। বরং ইহা তো মা'রেফতের গোপন রহস্য এবং হিকমতের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব যাহা সৃষ্টির বিধানের পাতায় পাতায় লিখা আছে বলিয়া নজরে আসে। এবং এই এন্তেজামকে মান্য করা ছাড়া খোদাতাআলার কুদরতে কামেলা (পরিপূর্ণ শক্তি) সাবেত করাই মুস্কিল। এবং তাহার খোদায়ীও চলিতে পারে না। যদি প্রতিটি পরমাণু ফিরিশ্‌তা হইয়া তাহার এতায়াত না করে তাহা হইলে এই কারখানা-এ-কুদরত কীভাবে চলিতে পারে কেহ আমাদিগকে একটু বুঝাইয়া দিক তো দেখি? এবং যদি আকাশের ফিরিশ্‌তাদের রূহানী নেযাম দ্বারা খোদাতাআলার কুদরতের শানে কোন কলংক হইতে না পারে, তাহা হইলে কেন ফিরিশ্‌তাদের জিসমানী নেযাম মানিয়া নিলে যাহা রূহানী নিযামেরই মত খোদাতাআলার কুদরতে কামেলার উপরে কলংকের ছাপ লাগিবে না ? বরং সত্য কথা হইল ইহাই যে, আর্য সমাজী এবং তাহাদেরই মত অন্যান্যরা যাহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী তাহারা শুধু তাহাদের রূহানী দৃষ্টি শক্তি না থাকার কারণে খামাখা এই ধরনের এতরাজ করিয়াছে যাহার আসল শিকড় বহু পাদটীকাসহ তাহাদের নিজের ঘরে বিদ্যমান আছে। এবং অন্যায়ভাবে নিজেদের দিব্যদৃষ্টি না থাকার কারণে একটি সুন্দর সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে।

(ফারসী নজম ও উহার অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না – অনুবাদক)

এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসারে ফিরিশ্‌তাদের বৈশিষ্ট্য মানবকুলের বৈশিষ্ট্য হইতে কোন কিছুতেই বেশী বা উচ্চতর নহে; বরং মানবকুলের গুণাবলী ফিরিশ্‌তাদের গুণাবলী হইতে উন্নততর মর্যাদা রাখে। এবং রূহানী নেযাম বা জিসমানী নেযামের মধ্যে তাহাদের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে না, বরং কুরআন শরীফের রূহ অনুসারে তাহাদিগকে, সেবক হিসাবে সেবা করার কাজে লাগানো হইয়াছে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ফরমাইতেছেন।

"সেই খোদা যিনি সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন" *(ইব্রাহীম রুকূ নং ৫)*।

যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এক পত্র বাহক বাদশাহের নিকট হইতে তাহার পত্র কোন প্রাদেশিক গভর্ণর বা গভর্ণর জেনারেলের নিকট পৌছাইয়া দেয় তবে কি সেই পত্র বাহক গভর্ণর জেনারেল হইতে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য যে, সে বাদশাহ এবং গভর্ণর জেনারেলের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। সুতরাং খুব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর যে, ইহাই ফিরিশ্‌তাগণের উদাহরণ যাহারা নেযামে জিসমানী এবং নেযামে রূহানীর মধ্যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করার জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন, সেই কাদেরে মুতলকের এরাদাগুলিকে পৃথিবীতে পৌছাইয়া থাকেন এবং ঐগুলিকে পরিপূর্ণতা দান করিতে ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বহু জায়গায় ফরমাইয়াছে যে, যাহা কিছু আসমান এবং জমীনে পয়দা করিয়াছেন তাহা সবই মানুষের তুফায়েলে পয়দা করিয়াছেন। অর্থাৎ শুধু মানুষের ফায়দার জন্য পয়দা করিয়াছেন এবং ইনসান স্বীয় মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবার উপরে এবং সবাই তাহার সেবায় নিয়োজিত। সে সবার মখ্‌দুম এবং অন্যান্যরা তাহার খাদেম এবং তিনি ফরমাইতেছেন, "এবং তিনি চালিত করিয়াছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের সেবার জন্য যাহারা সবদাসর্বদা চলাফেরা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ধর্মে এবং বৈশিষ্ট্যে সর্বদা এক অবস্থায় থাকে না, স্থান পরিবর্তন করে; দৃষ্টান্তস্বরূপ শীতের সময়ে সূর্যের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় গ্রীষ্মের সময়ে তাহা অবশ্যই থাকে না। সুতরাং সূর্য এবং চন্দ্র এইভাবে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে সব সময়েই ; কখনও তাহাদের প্রদক্ষিণের ফলে বসন্ত আসে আবার কখনও গ্রীষ্মকাল আসে কখনও শীতকাল আসে। এবং কোন কোন সময়ে এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং কখনও উহার বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। তারপর ফরমাইয়াছেন রাত এবং দিনকে তোমাদের জন্য সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছি প্রত্যেক ঐ সকল বস্তু যাহা তোমাদের প্রকৃতি চায়, অর্থাৎ তোমাদিগকে ঐ সব জিনিস দিয়াছি যাহার উপরে তোমরা নির্ভরশীল, আর যদি তোমরা খোদাতাআয়ালার নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাও তাহা হইলে গণনা করিতে পারিবে না। তিনিই সেই খোদা যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তোমাদের ফায়দার জন্য দৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা আরেক আয়াতে ফরমাইতেছেন অর্থাৎ মানুষকে আমরা সুষমভাবে তৈরী করিয়াছি, এবং সে এই সুষম তৈরীর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুন্দর। অতঃপর আর এক জায়গায় ফরমাইয়াছেন অর্থাৎ "আমাদের আমানত যাহার অর্থ এশক্ ও মহব্বতে এলাহী এবং পরীক্ষায় পড়িয়া তার পরে পরিপূর্ণ এতায়াত করা–আসমানের তামাম ফিরিশ্‌তা এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপরে এবং পাহাড়গুলির উপরে এই আমানতের ভার বহনের জন্য দায়িত্ব দিয়াছিলাম যাহারা বাহ্যতঃ বড়ই শক্তিশালী এবং বিশালবপু মনে হয়–কিন্তু তাহারা সবাই এই আমানতের ভার-বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার আযমতকে (বিশালত্বকে) দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষ ইহাকে উঠাইয়া নিয়াছে–কেননা, মানুষের মধ্যে দুইটি গুণ আছে (১) প্রথমতঃ সে খোদাতাআলার রাস্তায় নিজের নফসের উপরে যুলুম করিতে পারে (২) দ্বিতীয়তঃ খোদাতাআলার মহব্বতে ঐ দরজা পর্যন্ত পৌছিতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবকিছুকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে (চলবে)।

অনুবাদ– ওবায়দুর রহমান ভুইয়া

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(নবম কিস্তি)

আরেক জায়গায় আল্লাহ্‌তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্ যিনি তোমার প্রভু (যাহার তুমি পূর্ণ-বিকাশ) ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, আমি মাটি হইতে এক মানুষ পয়দা করিব, অতঃপর যখন আমি ইহাকে পরিপূর্ণ ও সুষমরূপ দিব এবং আমার আত্মা (রূহ) হইতে উহাতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা উহার জন্য সেজদায় অবনত হইও ; অর্থাৎ কামাল এনকেসারির সাথে অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে তাহার খেদমতে মশগুল হইয়া যাও যেন তোমরা উহাকে সেজদা করিতেছ। অনন্তর সমস্ত ফিরিশ্‌তাগণ ইনসানে কামেলের সামনে সেজদায় অবনত হইল কিন্তু এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল যে, সে-ই শয়তান। জানা থাকা উচিত যে, এই সেজদার হুকুম সেই সময় হয় নাই যখন হযরত আদমকে পয়দা করা হইল বরং ইহা আলাদাভাবে ফিরিশ্‌তাগণকে হুকুম করা হয়, যখন কোন ইনসান তাহার ইনসানীয়তের হাকীকী মরতবা পর্যন্ত পৌঁছে এবং মানবীয় গুণাবলীর সুষম বিকাশ তাহার মধ্যে ঘটে এবং খোদাতাআলার রূহ্ তাহার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে তখন তোমরা সেই কামেলের সামনে সেজদায় অবনত হও অর্থাৎ আসমানী নূরসমূহ নিয়া তাহার উপরে অবতীর্ণ হও এবং তাহার উপরে সালাত পাঠাও । সুতরাং ইহা খোদাতাআলার সেই প্রাচীন বিধান যাহা খোদাতাআলা তাহার বরগুজিদা বান্দাদের সাথে জারী রাখিয়াছেন চিরকাল। যখন কোন জামানাতে কোন ব্যক্তি রূহানীয়তের পূর্ণতা লাভ করে এবং খোদাতাআলার রূহ্ তাহার মধ্যে আবাদ হইয়া যায় ; অর্থাৎ স্বীয় নফসকে ফানা করিয়া দিয়া বাকা বিল্লাহের দর্জা হাসেল করিয়া ফেলে, তখন এক বিশেষভাবে ফিরিশ্‌তাগণ তাহার উপর অবতীর্ণ হইতে থাকে ; যদিও সুলুকের প্রথম স্তরেও ফিরিশ্‌তাগণ তাহার সাহায্য এবং খেদমতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই নুযূল বা অবতরণ এতটা পরিপূর্ণ এবং গুণগত মানে উন্নত হয় যে, ইহা সেজদাতুল্য হইয়া থাকে। সেজদা শব্দ ব্যবহারের ফলে আল্লাহ্ ইহাও জানাইলেন যে, ইনসানে-কামেল হইতে মালায়েক (ফিরিশ্‌তাগণ) শ্রেষ্ঠ নন। বরং শাহী খাদেমদের মত ইনসানে কামেলের সামনে সেজদাতে তাজীম সম্পন্ন করিতেছে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তাআলা সূরা শামসের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ইশারার মাধ্যমে রূপকের ব্যবহার দ্বারা ইনসানে কামেলের মরতবা আকাশমালা ও পৃথিবীর সমস্ত সত্তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন তিনি ফরমাইয়াছেনঃ- অর্থাৎ, "কসম সূর্যের এবং উহার রৌদ্রের ; এবং কসম চন্দ্রের যখন উহা সূর্যকে অনুসরণ করে। এবং কসম দিনের যখন উহা স্বীয় আলো প্রকাশ করে। এবং কসম রাত্রির যখন উহা সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এবং কসম জমীনের এবং তাঁহার যিনি উহাকে বিছাইয়াছেন। এবং কসম ইনসানের নফসের এবং তাঁহার যিনি তাহাকে সুষম বিকাশের দ্বারা কামালিয়ত হাসেলের ব্যবস্থা এনায়েত ফরমাইয়াছেন এবং এস্তেকামতের (রূহানীয়তের পথে দৃঢ়তের) দ্বারা সমস্ত কামালিয়ত হাসেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কোন প্রকার কামালিয়ত হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। বরং সমস্ত কামালীয়ত যাহা উপরে উল্লেখিত কসমসমূহের মধ্যে একত্রিত করা হইয়াছে তাহা মানুষের মধ্যে (ইনসানে কামেলের মধ্যে) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইভাবে ইনসানে কামেলের নফ্‌স সূর্যের এবং উহার রৌদ্রের গুণাবলীও নিজের সত্তার মধ্যে ধারণ করে ; এবং চাঁদের যে গুণাবলী তাহাদেরও সন্নিবেশ ঘটায় নিজের মধ্যে অর্থাৎ সে অন্যের নিকট হইতে ফয়েজ (কল্যাণ) হাসেল (আহরণ) করিতে পারে ; এবং এক নূর হইতে ফায়দা হাসেল করিয়া নিজের মধ্যেও নূর গ্রহণ করিতে পারে ; এবং তাহার মধ্যে আলোকময় দিবসের গুণাবলীও বিদ্যমান আছে যেভাবে যাহারা মেহনত ও মজদুরী করে তাহারা দিবালোকে তাহাদের কাজ কারবার সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, তেমনিভাবে সত্যের যাহারা অনুসন্ধান করে এবং রূহানীয়তের পথের যাহারা পথিক তাহারা ইনসানে কামেলের অনুসরণ করিয়া তাহার আদর্শকে নমুনাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া খুব সহজে এবং সরল সাবলীল উপায়ে স্ব স্ব ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে পারে। সুতরাং সে দিবসের মত নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারে এবং দিবসের মত সমস্ত গুণাবলী নিজের মধ্যে একত্রিত করে।* (চলবে)

অনুবাদ- **ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া**

** পাদটীকা ঃ সূর্য আল্লাহ্‌তাআলার প্রভায় সাতশত ত্রিশ প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; এবং প্রত্যেক প্রকারের রূপের কারণে তাহার একটি বিশেষ নাম দেওয়া যাইতে পারে - যেমন শনি, রবি, সোম এই সমস্ত নামসমূহে প্রকৃতপক্ষে সূর্যের বিভিন্ন বিশেষ প্রকারের বিকাশের প্রভাবসমূহকেই বুঝাইয়াছে। যখন এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাব ও বিকাশকে মনে রাখা হইবে না তখন সাধারণভাবে ইহাকে সূর্য নামে অভিহিত করা হইবে ; আর যখন সূর্যের বিভিন্ন প্রকার গুণের প্রভাব ও বিকাশের কথা স্মরণ করা হইবে তখন বলা হইবে বিভিন্ন নাম - যেমন রবি, সোম, মঙ্গল - কখনও বলা হইবে দিন, কখনও বলা হইবে রাত, কখনও ইহার নাম রাখা হইবে রবিবার, কখনও সোমবার। আবার কখনও ইহার নাম হইবে শ্রাবণ, কখনও ভাদ্র, কখনও আশ্বিন, কখনও কার্তিক। মোটকথা হইতেছে এই সবই সূর্যের নাম। তেমনিভাবে মানুষের নফসেরও বিভিন্ন অবস্থা ও প্রভাব বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ ও বিকাশের কারণে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। কখনও নফসে যাকীয়া, কখনও নফসে আম্মারা, কখনও নফসে লাওওয়ামা, কখনও নফসে মুৎমাইন্নাহ্। মোটকথা হইতেছে মানুষের নফসেরও ততগুলিই নাম আছে যতগুলি নাম সূর্যের আছে, কিন্তু বিষয়টি দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এখানেই ইহাকে সীমাবদ্ধ করা হইল।*

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(নবম কিস্তি)

অন্ধকার রাত্রির সঙ্গেও ইনসানে কামেলের এক প্রকার মিল আছে। যদিও খোদার তরফ হইতে ইনকেতাহ (সব কিছু হইতে সম্পর্কহীন নির্লিপ্ততা) ও তাবাত্তুল (সম্পূর্ণ প্রশান্তি) রূপ অতুলনীয় গুণে সে ভূষিত তবু কখনও কখনও সে নিজের নফসের অন্ধকারাচ্ছন্ন খাহেশাত- ইন্দ্রীয়ের মোহাচ্ছন্নতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহাদের দিকে খোদাতাআলার হিকমত এবং মাসলেহাতের কারণে মনোনিবেশ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ নফসের যে সমস্ত হক (আত্মার যে সমস্ত অধিকার) মানুষকে দান করা হইয়াছে তাহাও আদায় করে- যাহা বাহ্যতঃ নূরানীয়ত্ব (আলোকের)-এর পরিপন্থী বা অন্ধকার বলিয়া মনে হয় যেমন খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা যাপন, বিবির হক আদায় করা অথবা সন্তানদের আদর-সোহাগ করা। এই সমস্ত হক সে আদায় করে এবং কিয়ৎকালের জন্য এই অন্ধকারকে নিজের জন্য পসন্দ করে--এইজন্য নয় যে, সত্যি সত্যি সে এই অন্ধকারকে পসন্দ করে বা এই দিকে তাহার ঝোঁক আছে বরং এইজন্য যে, খোদাওন্দ আলীম ও হাকীম তাহাকে এই দিকে মনোযোগ দান করেন যেন রূহানী জোহাদের কারণে তাহার যে একঘেয়েমী ও ক্লান্তি তাহা দূর হয়। এবং কিছুটা আরাম করিবার পরে যেন আবার নূতন উদ্যমে কাজ করিতে পারে (পারসী কবিতার লাইন ও উহার অর্থ উদ্ধৃত করা সম্ভব হলো না--অনুবাদক)

সুতরাং এইভাবেই এই সমস্ত কামেল লোকেরা যখন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয় এবং বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন কিছুটা বিশ্রাম ও আরাম করিবার জন্য আবশ্যকীয় নফসানী খায়েশাতকে পূর্ণ করিয়া কিছুটা আরাম লাভের পরে তাহাদের দেহ ও মন আবার রূহানী সংগ্রামের পথে তাহাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য আরও অধিক শক্তিশালী হইয়া পড়ে এবং নূতনভাবে তাহাদিগকে খানিকটা বিশ্রামের কারণে বড় বড় নূরানী মারহালা (মার্গ) অতিক্রম করিতে সাহায্য করে। এবং ইহা ব্যতীত নফসে ইনসানের ভিতর রাত্রির আরও অনেক গুণাবলী (দেখিতে) পাওয়া যায় যাহা পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান আবিস্কার করিতে পারিবে। তেমনিভাবে ইনসানে কামেলের নফসের সহিত আসমানেরও সাদৃশ্য বিদ্যমান, যেমন আকাশের যে বিস্তৃতি ও গভীরতা যাহা কোন জিনিস দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তেমনিভাবে বুযর্গদের নফসে নাতেকা (তৃপ্তিহীন আত্মা) সীমাহীন বিস্তৃতি ও প্রশান্তির অধিকারী ; এবং যদিও হাজার রকমের হাকায়েক ও মায়ারেফ-- অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলব্ধ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশীতত্ত্ব-জ্ঞান হাসেল করিবার পরেও মাআরাফনাকা (আমরা তোমাকে চিনিতে পারি নাই) বলিয়া 'নারা' লাগায় এবং যেভাবে আকাশের গর্ভে আলোকময় তারকারাজি দ্বারা পরিপূর্ণ তেমনিভাবে ইনসানে কামেলের মধ্যে (নেহায়েত রওশন কুয়্যত) অতি উচ্চ ধরনের আলোকময় শক্তি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যাহা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মত ঝলমল করিতে দেখা যায়। তেমনিভাবে ইনসানে কামেলের নফসের সহিত জমিনেরও সাদৃশ্য বিদ্যমান যেমন-একটি ভাল কৃষিক্ষেত্র যাহা অতি উত্তম ফসল ফলাইবার ক্ষমতা রাখে, যখন ইহাতে বীজ বপন করা হয় এবং ভালভাবে নিড়ানী দেওয়া হয় এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং কৃষি বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার মেহনতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা হয় তখন ইহা অন্যান্য জমিন হইতে হাজার গুণ বেশী ফসল ফলায় এবং ইহার ফসল অন্যান্য জমিনের ফসলের চাইতে গুণগত মানের দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠ হয়। অন্যান্য জমিনের ফল হইতে ইহা বেশী সুস্বাদু হইয়া থাকে এবং সংখ্যাগত মানেও অনেক বেশী ফসল ফলায় এবং সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় মানেই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে। ইনসানে কামেলের অবস্থাও এই রকমই হইয়া থাকে। খোদাতাআলার বিভিন্ন হুকুম আহকামের দ্বারা তাহার হৃদয়ে বীজ বপন হইয়া থাকে তাহার পর উহা অদ্ভুত রকমের শ্যামলিমায় রূপান্তরিত হয় তখন সেখানে তাহার সৎকার্যাবলীর চারাগুলি বাহির হইয়া আসে ; এবং ইহাদের ফল এত উচ্চমানের এবং এত সুস্বাদু হয় যে, প্রত্যেক অবলোকনকারী ইহা অবলোকন করিয়া খোদাতাআলার পাক কুদরতের কথা স্মরণ করে এবং সুবহানাআল্লাহ্ সুবহানাআল্লাহ্ বলিতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই আয়াত "ওয়া নাফ্‌সিওঁ ওয়ামা সাওওয়াহা- পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতেছে যে, ইনসানে কামেল তাহার গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার দিক দিয়া এক জগততুল্য এবং বিশ্বজগতের সমস্ত মর্যাদা ,গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসাবে তাহাতে ঐগুলির সমাহার ঘটাইয়াছে বলিয়া আল্লাহ্‌তাআলা সূর্যের গুণাবলী হইতে শুরু করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত যাহা আমাদের স্থিরতার জায়গা, সমস্ত জিনিসের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। অর্থাৎ কসম দ্বারা উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের পরে ইনসানে কামেলের নফসের কসম খাইয়াছেন যেন এই কথা বুঝা যায় যে, ইনসানে কামেলের নফস ঐ সমস্ত বিভিন্ন প্রকার কামালাতের সমাহার যাহা উল্লেখিত জিনিসগুলি তাহাদের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া যায়। যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, খোদাতাআলা তাঁহার সৃষ্ট জিনিষের উপর যাহা তাঁহার তুলনায় ভিত্তিহীন ও অতি তুচ্ছ- কেন কসম খাইয়াছেন, তাহা হইলে ইহার জবাব এই হইবে যে, তামাম কুরআন শরীফের ভিতরে খোদাতাআলার এই অমোঘ বিধান পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি এই ধরনের জিনিসের কসম খাইয়া থাকেন। কোন কোন জিনিস যাহাদেরকে বাহ্য চোখে দেখা যায় এবং তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ দিতে হয় না ইহারা এমনি তাহাদের আপন সত্তায় সপ্রমাণিত যেমন সূর্য-সূর্যের অস্তিত্বের সম্পর্কে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে না। এবং তাহার রৌদ্রের ব্যাপারেও কাহারও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এবং চন্দ্র মজুদ আছে এবং ইহা সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে এই ব্যাপারেও কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং দিবসের আলোও সবাই দেখিতে পায় তাই দিবসের অস্তিত্বের ব্যাপারেও কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; রাত্রিকেও সবাই দেখিতে পায়; এবং আকাশের যে বিস্তৃতি ইহাও সবার কাছে দেদীপ্যমান। এবং পৃথিবীতে মানুষের নিজেরই শান্তি ও স্থিতির জায়গা। এখন যেহেতু এই সমস্ত জিনিসই নিজেদের স্বকীয় স্বত্তায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান আছে এবং এ ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তির কোন কারণ নাই কিন্তু মানুষের নফস (আত্মা) এমন এক জিনিস যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কেই বহু ঝগড়া আছে যাহা লুক্কায়িত এবং গুপ্ত। তাই এ রকম বহু ফিরকা আছে ইহা মানিতেই রাজী নহে যে, মানুষের আত্মারও একটা স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। এবং ইহা একটি চিরস্থায়ী জিনিস এবং ইহারও একটা স্বকীয় সত্তা আছে- যাহা শরীর হইতে আলাদা হওয়ার পরেও চিরস্থায়ী হইতে পারে। এবং কিছু লোক আছে যাহারা নফসের অস্তিত্ব এবং ইহার স্থায়িত্ব তো মানিয়া নেন তবে ইহার বাতেনী ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে ঐরূপ যত্নবান হন না যেইরূপ হওয়া উচিত ; বরং কিছু কিছু লোক তো এমন মনে করেন যে, আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি শুধু খানা-পিনা এবং পশুদের মতো নফসানি খায়েশাত মিটাইবার জন্য এবং এইভাবেই আমরা যেন জীবন পার করিয়া দেই। তাহারা একথা জানেও না যে, নফসে ইনসানী কত উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন ক্ষমতা রাখে এবং ইহার মধ্যে কত রূহানী কুয়্যৎ ও তাকৎ লুক্কায়িত আছে ; এবং যদি সে (কসবে কামালাত) পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে এবং সেইদিকে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত জগতের সর্বপ্রকার কামালাত হাসেল করিতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ লাভ করিতে পারে এবং সবকিছুকে এক বৃত্তের মত

(২২পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তৌযীহে মরাম (১৬ পৃষ্ঠার পর)

নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই মোবারক সূত্রে গ্রথিত নফসে-ইনসানীর ক্ষমতা ও তাহার অসীম বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর মানুষের স্বকীয় সত্তার দিকে ইশারা করিয়াছেন যে, সে ঐ সমস্ত বিভিন্ন গুণাবলীর চরম বিকাশস্থল হইতে পারে। এবং যেখানে নফসে ইনসানের মধ্যে (মানুষের স্বকীয় আত্মার মধ্যে) এই ধরনের অতি উচ্চ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার দেখা যাইতেছে, যাহাদেরকে পৃথিবী এবং আকাশের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন প্রকারে সেখানে এই চিন্তা করা যে, এই ধরনের আযীমুশ্‌শান (অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) ব্যক্তিত্ব যে সমস্ত কামালীয়্যতের পরিপূর্ণ বিকাশস্থল সে কোন জিনিসই না এবং মৃত্যুর পরে তাহার কোন অস্তিত্ব বাকী থাকিবে না এই ধরনের চিন্তা করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা। অর্থাৎ এই সমুদয় বৈশিষ্ট্য যাহা ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায় যাহা আমাদের চারিদিকে উপস্থিত ও সাক্ষ্য দিতেছে এবং আমরা অনুভব করিতেছি মানুষের মধ্যে ঐ সমস্ত কামালাত বিদ্যমান- যাহাদের চিরস্থায়ী অস্তিত্ব মানিয়া লইতে তোমাদের কোন আপত্তি নাই তখন নফসের চিরস্থায়িত্ব এবং তাহার স্বকীয় সত্তার বিদ্যমান থাকার মধ্যে তোমাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে ? ইহা কি সম্ভব যে, সে সমস্ত জিনিস তাহারা স্বকীয় সত্তায় কোন জিনিসই নয়, তাহারা যে সমস্ত জিনিস নিজেদের আপন স্বত্তায় বিদ্যমান, তাহাদের সমস্ত গুণাবলী নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তাহার চিরস্থায়ী অস্তিত্বে তোমাদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। যেমন, রৌদ্রের উপস্থিতি অনুভব করিয়া একজন অন্ধও সূর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে তখন মানুষের (নফসে ইনসান) আত্মা যাহার মধ্যে সমস্ত কিছুর গুণাবলী একত্রিত করা হইয়াছে তাহার চিরস্থায়িত্বও আমাদের স্বীকার করা উচিত। এখানে আল্লাহ্‌তাআলা কসম খাওয়ার নিয়মকে এখতিয়ার করিয়াছেন এইজন্য যে, কসম দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়। ইহা সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত। যখন কোন সাক্ষ্য পাওয়া না যায় তখন দুনিয়াবী আদালতের সাক্ষ্যের পরিবর্তে কসম গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা হইয়া থাকে এবং এক মরতবার ফায়দা হাসেল করিয়া থাকে যাহা কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী হইতে হাসিল করা যাইত। সুতরাং যেহেতু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আইন-আদালতে ও শরীয়তে কসমকে সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত করা হয় ; এইজন্য ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া খোদাতাআলা এই জায়গায় সাক্ষ্য হিসাবে কসম খাইয়াছেন, সাক্ষীর জায়গায় কসমকে হাজির করিয়াছেন। সুতারাং খোদাতাআলার এই কথা বলা যে, কসম সূর্যের এবং তাহার রৌদ্রের- ইহার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে নফসে ইনসানের মধ্যে সূর্যের এবং রৌদ্রের গুণাবলী বিদ্যমান আছে এবং ইহারা দুইটিই মানুষের আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যেমন সূর্য ও রৌদ্র আপন অস্তিত্বে বিদ্যমান তেমনিভাবে মানুষও তার আত্মা ও আপন অস্তিত্বে বিদ্যমন। কেননা, সূর্যের মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে তাহার দ্বারা আলো ও উত্তাপ পয়দা হয় তেমনিভাবে নফসে ইনসানের মধ্যেও আরও কিছু বৃদ্ধি করিয়া একই ধরনের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। মুকাশেফাত-এর রৌশনী (দিব্যজ্ঞানের আলো যাহা সত্য স্বপ্ন-কাশফ ইত্যাদির দ্বারা লাভ করা যায়) এবং মনোসংযোগ দ্বারা যে রূহানী উত্তাপ সৃষ্টি করা যায় তাহা সূর্যের আলো ও উত্তাপ হইতে অনেকগুণ বেশী প্রখর ও দেদীপ্যমান হইয়া থাকে এবং অনেক বেশী আশ্চর্যজনক ফল দান করে। সুতরাং সূর্য যেখানে (মজুদ বিজ্‌জাত) আপন স্বত্তায় বিদ্যমান সেখানে নফসে ইনসান যাহার সদৃশ সূর্য ও যাহার তুলনা করা হইয়াছে সূর্যের সহিত সম মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া, বরং তাহার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী, সেই নফসে ইনসান মানুষের আত্মা কীভাবে আপন সত্তায় বিদ্যমান না থাকিতে পারে ? তেমনিভাবে খোদাতাআলার এই কথা বলা যে, কসম চন্দ্রের যখন উহা সূর্যের অনুসরণ করে, এর অর্থ এই যে, চন্দ্র যেভাবে সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে তেমনিভাবে মানুষের মধ্যেও কিছু মানুষ আছে যাহারা ইনসানে কামেল হইতে ফায়দা হাসেল করে যাহারা সত্যকে অনুসন্ধান করে সত্য গ্রহণের ক্ষমতা রাখে তাহারা ইনসানে কামেলের অনুসরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে নূর লাভ করে। সুতরাং চাঁদ এবং চাঁদের আলোর অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্ব ও তাহার আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। নফসে ইনসানের কায়েম বিজ্‌জাত এবং মজুদ বিজ্‌জাত আপন সত্তায় বিদ্যমান এবং স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা, চাঁদ যেভাবে সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে, সেইভাবে মানুষের নফ্‌স (আত্মা) ও যাহার মধ্যে অপর আত্মা হইতে গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে এবং সত্যের অনুসন্ধানের ক্ষমতা আছে, তাহারা অন্য লোক যাহারা ইনসানে কামেল তাহাদের নিকট হইতে নূর হাসেল করিতে পারে তাহাদের পায়রবী করিয়া এবং তাহার বাতেনী ফয়েজ (আধ্যাত্মিক কল্যাণ) লাভ করিতে পারে ; বরং চন্দ্র হইতে আরও বেশী আলো গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। কেননা, চাঁদ তো আলোকে গ্রহণ করিয়া আবার তাহা ছাড়িয়াও দেয় কিন্তু এই মানুষের আত্মা কখনও ইহাকে ছাড়ে না। সুতরাং আলো গ্রহণের ব্যাপারে চন্দ্রের যে গুণ তাহা তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তাহা হইলে চাঁদকে মজুদ বিজ্‌জাত এবং কায়েম বিজ্‌জাত অর্থাৎ আপন সত্তায় বিদ্যমান এবং স্বকীয় গুণাবলীসহ প্রতিষ্ঠিত মনে করা হয় ; তাহা হইলে মানুষের আত্মাকেও চাঁদের মত চিরস্থায়ী ও বিদ্যমান বলিয়া মনে না করার পিছনে কি কারণ থাকিতে পারে ? কেন ইহাকে চিরস্থায়ী বলিয়া অস্বীকার করা হয় ? (চলবে)

অনুবাদ- **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(দশম কিস্তি)

মোট কথা হইতেছে এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা যে সমস্ত বস্তুর কসম খাইয়াছেন মানুষের আত্মার উল্লেখ করার পূর্বে, তাহাদের প্রত্যেকের গুণাবলী মানুষের মধ্যে থাকার কারণে তাহাদেরকে মানুষের আত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী হিসেবে পেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের সত্তাকে বাংময় অস্তিত্ব হিসেবে পেশ করিয়াছেন এবং এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, মানুষের আত্মা আসলেই বিদ্যমান আছে এবং চিরস্থায়ী। তেমনিভাবে কুরআন শরীফের যত জায়গায় যত বড় বস্তুর কসম খাওয়া হইয়াছে প্রত্যেক জায়গাতেই এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত বস্তুর গুণাবলী মানুষের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে বিদ্যমান আছে যেন লুক্কায়িত বস্তু ও প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা প্রকাশিত হয় ও উহাদিগকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা যায়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে সমস্ত প্রকাশিত বস্তুর গুণাবলী মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বলিয়া দাবী করা হয়, তাহা যে সত্যি সত্যি মানুষের মধ্যে আছে উহার কী প্রমাণ আছে ? এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু, ইহার পরে ফরমাইয়াছেন, "ফায়াল হামাহা ফুজুরাহা তাকওয়াহা ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়া ক্বাদ খাবা মান দাস্‌সাহা- অর্থাৎ খোদাতাআলা মানুষের আত্মাকে পয়দা করিয়া আলো এবং অন্ধকার, অনাবাদ শস্যহীনতা এবং শস্যপূর্ণ শামলিমার এই দুইটি পথই তাহার জন্য খুলিয়া দিয়াছেন। যেই ব্যক্তি যুলুম ও ফুজুর অর্থাৎ বদকারীর রাস্তা এখতিয়ার করিবে তাহাকে ঐ রাস্তায় উন্নতি দান করা হইবে এবং তাহাকে কামাল দরজায় পৌছান হইবে অর্থাৎ তাহাকে ধ্বংসের সর্বশেষ স্তরে পৌছান হইবে যাহাতে তাহার সাথে অন্ধকার রাত্রের সামঞ্জস্য পূর্ণতা লাভ করে ; এবং পাপ ও পংকিলতা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য বা ধ্যান-ধারণায় সে কোন আনন্দ পায় না। এই ধরনের সঙ্গী-সাথী তাহার কাছে ভাল লাগে, এবং এই ধরনেরই কার্যকলাপ তাহার মনকে আনন্দ দেয়। এবং তাহার বদ-তরবীয়তের মুনাছেবে হাল ইলহাম তাহার উপর হইতে থাকে অর্থাৎ সবসময়ে বদমায়েসী এবং কুকার্যের কুচিন্তা তাহার মনে উদয় হইতে থাকে, কখনও তাহার অন্তরে কোন ভাল কথার চিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু যদি সে পরহেযগারীর নূরানী রাস্তা এখতিয়ার করে (তাক্‌ওয়ার আলোক উজ্জ্বল পথ বাছিরা নেয়) তাহা হইলে সেই নূরকে সাহায্য করার জন্য ইলহাম তাহার উপর হইতে থাকে অর্থাৎ তাহার অন্তরের মধ্যে খোদাতাআলার যে নূর বীজের মত লুক্কায়িত আছে তাহার বিশেষ বিশেষ ইলহাম দ্বারা তাহাকে কামাল দরজা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেন (অর্থাৎ তাহাকে উন্নতির সর্ব উচ্চ শিখরে আরোহণের ব্যবস্থা করেন) এবং তাহার মধ্যে রওশন মুকাশেফাতের (আলোকোজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টির) আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করেন, তখন সে নিজের উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়া এবং উহার উপকারিতাসমূহে উপকৃত হইয়া ও তাহাদের দ্বারা অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হইয়া, উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া (দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত) হৃদয়ংগম করিতে পারে যে, সূর্য এবং চন্দ্রের আলোকে গ্রহণ করা এবং দান করার ক্ষমতা আমার মধ্যেও আছে ; এবং সুবিস্তৃত তারকা খচিত আকাশের মত আমার হৃদয়-আকাশেও সেই ক্ষমতাসমূহের খনি বিদ্যমান আছে যাহা বক্ষকে প্রসারিত করে এবং আকাঙক্ষাকে উচ্চতা দান করে, হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আলোকে ভাস্বর করে এবং এইকথা বুঝার জন্য তাহার আর কোন বাহ্যিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না বরং তাহার ভিতর হইতেই এক প্রস্রবণ সব সময় জোশের সাথে ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে এবং তাহার পিপাসিত অন্তরকে আকণ্ঠ পান করায়। এবং যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, সুলুকের (পথ চিনার) জন্য কিতাবে এই আত্মার এই বৈশিষ্ট্যের কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাইবে তাহা হইলে ইহার জবাবে আল্লাহ্ তাআলা জাল্লা শানুহু ইরশাদ ফরমান, "ক্বাদ আফালাহা মান যাক্কাহা ওয়া ক্বাদ খাবা মান দাস্‌সাহা" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সেই ব্যক্তি বিজয় লাভ করিয়াছে সর্বতোভাবে সর্বপ্রকার নীচ ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং খোদাতাআলার হুকুম আহকামের নীচে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে। সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য স্থলে পৌছাইবে এবং নিজের আত্মাকে ঐ ক্ষুদ্র পৃথিবীর মত নিজের আত্মাকে উৎকর্ষ সাধনের বিভিন্ন গুণাবলীতে ভুষিত দেখিতে পাইবে। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাহার নিজের নফসকে পাক করিবে না, বরং বাজে খাহেশাতের নীচে নিজের নফসকে গাড়িয়া দিয়াছে সেই ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারিবে না। এই বক্তব্যের সারাংশ হইতেছে এই যে, নিঃসন্দেহে মানুষের আত্মার মধ্যে সেই সমস্ত উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী বিভিন্ন প্রতিভা বিদ্যমান (যাহাকে কামালাতে মুতাফররেকা বলা হইয়া থাকে) যাহা সমস্ত বিশ্ব-জগতের মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাহাদের উপর একীন আনার জন্য ইহা একটি সরল পথ যে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে ও ইচ্ছা অনুসারে মানুষ যেন নিজের আত্মার সংশোধন কার্যে ব্যাপৃত হয়। কেননা, যখন সে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিবে সেই অবস্থায় শুধু এলমুল একীন নয় বরং হুক্কুল একীনের ন্যায় তাহার নিকট গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশিত হইতে থাকিবে যে, তাহার মধ্যে কী কী প্রতিভা লুক্কায়িত আছে তখন সে সত্যিকারের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। অতঃপর ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহ্‌তাআলা সামূদ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের পাহাড় প্রমাণ অহংকারের কারণে নিজেদের সময়ের নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে এবং এই তকযীবের জন্য এক বড় দুর্ভাগা দন্ডায়মান হয় এবং আগে বাড়ে। সেই সময়ের রসূল তাহাকে নসীহতস্বরূপ বলিলেন, নাকাতুল্লাহ্ অর্থাৎ খোদাতাআলার উটনী এবং তাহার পানি পান করার জায়গাকে বিনষ্ট করিও না। কিন্তু তাহারা এই কথা মানিল না এবং উটনীর পা কাটিয়া দিল। অনন্তর এই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপরে মৃত্যু আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে মাটির সাথে মিশাইয়া দিলেন। এবং খোদাতাআলা এই কথার মোটেও পরওয়া করিলেন না যে, তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহাদের বিধবা স্ত্রীদের এতীম বাচ্চাদের এবং অসহায় পরিবার-পরিজনের কী অবস্থা হইবে ! ইহা একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত যে, খোদাতাআলা মানুষের নফসকে নাকাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র উটনীর সাথে তুলনা করিয়া এই জায়গায় লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, মানুষের নফসকেও প্রকৃতপক্ষে এই কারণে পয়দা করা হইয়াছে যে, সে যেন আল্লাহ্‌র উটনীর কাজ করে। সে যখন ফানা ফিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তাহার উপর নিজের পাক তাজল্লী দ্বারা (পবিত্র ও জালালী বিকাশ) তাহার উপরে সওয়ার হইয়া যান যেইভাবে কেহ উটনীর উপরে আরোহণ করে। সুতরাং নফসপরস্ত লোক অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাস যে সমস্ত মানুষ তাহারা, যাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছে তাহাদিগকে তম্বী করিয়া সাবধান করিতেছেন যে, তোমারও সামূদের জাতির মত নাকাতুল্লাহ্ এর সুকীয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উটনীর পানি পান করার জায়গা যাহা ইয়াদে ইলাহী (আল্লাহ্‌র স্মরণ)

এবং মারেফতে ইলাহী (আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ)-এর প্রস্রবণ যাহার উপর এই নাকাত বা উটনীর জীবন নির্ভর করে উহাকে বন্ধ করিও না। শুধু বন্ধ নয় উহার পা কাটার পাঁয়তারা করিতেছ। যেন সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একেবারেই চলিতে না পারে। সতরাং যদি তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গল চাও তাহা হইলে উহার উপরে এই জীবন দানকারী জলকে বন্ধ করিও না এবং নিজেদের নীচ প্রবৃত্তির অহেতুক খাহেশাতের পায়রবী করিও না এবং উহার পা কাটিও না। যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে সেই নাকাতুল্লাহ্‌ যাহা আল্লাহ্‌র সওয়ারী হিসেবে তোমাদিগকে দান করা হইয়াছিল আহত হইয়া মরিয়া যাইবে তখন তোমাদিগকে নেহায়েত অকর্মণ্য এবং শুষ্ক কাষ্ঠ খন্ড বলিয়া গণ্য হইতে হইবে এবং কাটিয়া ফেলা হইবে। অতঃপর তোমাদিগকে আগুনে ফেলা হইবে। এবং তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমরা যাহাদিগকে পিছনে ছাড়িয়া যাইবে তাহাদের উপরও রহম করিবে না। বরং তোমাদের পাপ ও কুকর্মের বোঝা তাহাদের উপরও বর্তাইবে। এবং তোমরা শুধু তোমাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবেই মরিবে না বরং তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং বিবি-বাচ্চাকেও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করিবে। এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ হইতে পরিষ্কার ইহা প্রতীয়মান হয় যে, খোদাওন্দ করীম মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন, এবং ফিরিশ্‌তাগণ এবং গ্রহ-নক্ষত্ররাজি এবং অন্যান্য জিনিস যাহারা মানুষ এবং খোদাতাআলার মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তাহাদের মাধ্যমে হওয়া ইহা প্রমাণ করে না যে, তাহারা মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা মাধ্যমে হিসেবে কাজ করিয়া মানুষকে কোন মর্যাদা প্রদান করে না ; বরং তাহারা সম্মান লাভ করে যে, এই ধরনের অভিজাত ও ভদ্র সৃষ্টির সেবায় তাহাদেরকে লাগান হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাহারা সবাই সেবক, তাহারা সেবার বা পূজার উপযুক্ত নহে। (চলবে)

অনুবাদ- **ওবায়দুর রহমান ভূইয়া**

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১১শ কিস্তি)

অতঃপর আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি এবং বলিতেছি যে, আমরা যেভাবে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে, ফিরিশ্‌তাগণকে শুধু একই দরজার সম্মান এবং প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; না একই ধরনের কাজ তাহাদেরকে ন্যস্ত করা হইয়াছে বরং প্রত্যেক ফিরিশ্‌তাকে আলাদা আলাদা ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। পৃথিবীতে তোমরা যে ধরনের পরিবর্তন এবং বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ড দেখিতে পাও, অথবা যে সমস্ত ঘটনা গুপ্ত-শক্তিসমূহ দ্বারা ঘটিয়া থাকে অথবা যে ধরনের শরীর ও মন নিজেদের পরিপূর্ণতা লাভ করে যাহা তাহাদের আরাধ্য বিষয়, এই সবারই উপরে আকাশের কিছু প্রভাব কাজ করে। এবং কোন কোন সময়ে একই ফিরিশ্‌তা বিভিন্ন কাজের উপরে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে – দৃষ্টান্তস্বরূপ জিবরাঈল যিনি একজন অতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন ফিরিশ্‌তা তিনি আকাশের এক জ্যোতিষ্কে অবস্থান করেন, তাহাকে বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত খেদমতের স্বপক্ষে যাহাদের এই জ্যোতিষ্ক হইতে সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করা হয়, সুতরাং সেই ফিরিশ্‌তা যদিও এমন এক ব্যক্তির উপরে অবতরণ করে যাহার উপরে ওহী হইয়া থাকে (নযূলের আসল অর্থ প্রভাব বিস্তার করা এবং সত্যি সত্যি নামিয়া আসা নহে এই কথা মনে রাখিতে হইবে)। কিন্তু তাঁহার নাযিল হওয়ার প্রভাবগুলি প্রভাব বলয় বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ও শক্তি নিচয় অনুসারে ছোট ছোট অথবা বড় বড় প্রভাব বলয় বা বৃত্ত সৃষ্টি করে। তাহার রূহানী প্রভাব বিস্তারের সব চেয়ে বড় যে বৃত্তটি তাহা হইতেছে এই যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সঃ)-এর উপরে ওহী নাযিলের সহিত যাহা সম্পর্ক রাখে। এই জন্যই কুরআন শরীফে যে মা'রেফ (মারেফতের বিভিন্ন কথা) ও হাকায়েক (বিভিন্ন প্রকারের সত্যের প্রকাশ) কামালত (উৎকর্ষতা)হিকমত (প্রজ্ঞা) এবং বালাগত (ভাষার প্রাঞ্জলতা) সমূহের সর্ব উচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা অন্য কোন পুস্তকে নাই। এই মহান মর্যাদা অন্য কোন পুস্তকের নাই। এবং এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, (যেমন পূর্বেও এই দিকে ইশারা করা হইয়াছিল) প্রত্যেক ফিরিশ্‌তার প্রভাব মানুষের উপরে দুই রকম হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিভিন্ন প্রকারের বীজের উপরে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে (যাহা দ্বারা মানব সন্তানকে তৈরী করা হয়)। তারপর দ্বিতীয়তঃ প্রভাব বিস্তার করে তাহার অস্তিত্বে আসার পরে। ঐ প্রভাব ঐ ব্যক্তিকে তাহার প্রতিভাসমূহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সাহায্য করে, তাহার গোপন শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করে। সেই দ্বিতীয় প্রভাব যখন ইহা কোন নবী বা ওলীর ব্যপারে কাজ করে তখন উহা ওহী নামে আখ্যায়িত করা হয়। যখন কোন শক্তিপ্রাপ্ত আত্মা নূরে, ঈমান এবং নূরে মহব্বত-এর চরম উৎকর্ষতা লাভের কারণে সমস্ত কল্যাণরাজি উৎস আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং খোদাতাআলার জীবনদায়িনী মহব্বত তাহার মহব্বতের উপর প্রতিস্থাপিত হয় তখন এই সীমা পর্যন্ত মানুষকে অগ্রসর হওয়ার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় ইহা প্রকৃতপক্ষে সেই জন্মলগ্নের ফিরিশ্‌তার প্রভাব যাহা তাহাকে মাতৃগর্ভে দান করা হয়। অতঃপর যখন মানুষ পূর্বের প্রভাবে অতটুকু পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়া ফেলে, তখনই ফিরিশ্‌তাই আবার নূতনভাবে তাহার নূরের আসর (আলোর প্রভাব) সেই মানুষের উপরে বিস্তারিত করে, কিন্তু ইহা নয় যে, সে নিজ হইতে তাহা করে, বরং সে মধ্যবর্তী খাদেম (সেবক) হিসাবে ইহা করিয়া থাকে। একদিকে পানি প্রবাহিত হওয়ার নল হিসাবে ঐদিক হইতে আল্লাহ্‌তাআলার নূরের পানির প্রবাহ অন্য দিক হইতে উহাকে লাভ করার আকর্ষণ। ফিরিশ্‌তা নালী হিসাবে ইহা ঐ বান্দার কাছে পৌছাইয়া দেয়। তারপর যখন এই দুই মহব্বতের মিলনের সময় মানুষের আত্মা সেই ফয়েযের নালীর কাছে নিজেকে পেশ করে তখনই ঐ ওহীর ফয়েয তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, অথবা যদি এইভাবে বলা যায় যে, ঐ সময়ে জিব্‌রাঈল নিজের নূরানী ছায়া তাহার উপর নিপতিত করিয়া তাহার সেই পবিত্র অন্তরের উপরে একটি ছবি আঁকিয়া দেয়। আসমানে সেই ফিরিশ্‌তার আবাসস্থলের নাম যেমন জিবরাঈল তেমনি মানুষের আত্মার উপর অংকিত সেই অংকিত ছবির নামও জিবরাঈলই রাখা হয়। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ ফিরিশ্‌তার নাম আসমানে রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে অংকিত যে প্রতিচ্ছায়া পৃথিবীতে তাহার নামও পবিত্র আত্মা বা রূহুল কুদুসই রাখা সমীচীন হইবে। সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে, ফিরিশ্‌তা আসিয়া মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে না বরং তাহার একটি ছবি মানুষের পবিত্র আত্মায় প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টান্ত - স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তোমরা যদি কোন পরিষ্কার আয়নার সামনে দাঁড়াও তোমাদের মুখ দেখার জন্য তাহা হইলে সেই আয়নার আয়তন অনুসারে তোমাদের মুখের একটি অবয়ব ঐ আয়নায় অংকিত হইবে তৎক্ষণাতই, ইহাতে কোন দেরী হইবে না। ইহা নয় যে, তোমাদের মুখ তোমাদের মাথা কাটিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। মুখ গর্দানের উপরেই থাকিবে। শুধু ইহার একটি ছবি আয়নায় প্রতিফলিত হইবে। মুখ নিজের অবস্থানে কিন্তু ঠিকই থাকিবে। এবং ঐ প্রতিচ্ছবিটি কিন্তু সব ক্ষেত্রে সমান হইবে না বরং আয়নার মসৃণতা এবং আকার অনুসারে প্রতিফলিত হইবে। তেমনিভাবে জিবরাঈলের প্রভাব ও প্রত্যেক অন্তরের স্বচ্ছতা ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে প্রতিফলিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি তোমরা একটি আরশীর মধ্যে তোমাদের চেহারা দেখিতে চাও এবং উহার আয়না একটি ছোট আংটির মধ্যে লাগান থাকে তাহা হইলে উহাতেও তোমাদের মুখ দেখা যাইবে। কিন্তু মুখের অবয়ব ছোট আকারে দেখাইবে এবং প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যঙ্গ ছোট হইয়া উহাতে অংকিত হইবে। কিন্তু তোমরা যদি স্বীয় চেহারা একটি বড় আয়নাতে দেখিতে চাও তাহা হইলে সম্পূর্ণ চেহারা উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেখানে বড় আকারে সম্পূর্ণভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইবে এবং স্ব স্ব প্রকৃত আয়তন অনুসারে প্রকাশিত হইবে। অনন্তর ইহাই জিবরাঈল-এর প্রভাবসমূহের নজীর। ছোট হইতে ছোট ওলীর উপরও জিব্‌রাঈল (আঃ)-ই ওহীর প্রভাব ফেলিয়া থাকেন, আবার সেই জিব্‌রাঈলই হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সঃ)-এর দিলের মধ্যেও ওহীর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিয়াছেন। কিন্তু এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য ঐ ধরনেরই যেমন উপরে বর্ণিত ছোট আরশী

(বাকী অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তৌযীহে মরাম

(৮ম পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

এবং বড় আয়নার মধ্যে রহিয়াছে। অর্থাৎ যদিও দুইটি আয়নার মধ্যে একই জিব্‌রাঈলের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তবুও দুইটি প্রতিফলনের সাইজ এক নহে; একটি ছোট ও অস্বচ্ছ আরেকটি বড় ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ যদিও জিব্‌রাঈলের সুরতই দুইটির মধ্যে প্রতিফলিত জাহেরীভাবে ঐ জিব্‌রাঈলেরই প্রভাব দুইজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে কিন্তু দুই জায়গায় হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং ক্ষমতা এক নহে। এবং আমি যে এই জায়গায় হৃদয়ের সাফাই বা পরিচ্ছন্নতার কথা উল্লেখ করিয়াছি উহার কারণ এই যে, আমি এই কথা জাহির করিতে চাই যে, জিবরাঈলের প্রভাব শুধু কমিয়্যতের দিকেই নির্ভর করে না ইহা কৈফিয়্যতের উপরেও নির্ভর করে। অর্থাৎ জিব্‌রাঈলের প্রভাব শুধু হৃদয়ের আয়নার প্রসারতা সাইজের উপরেই নির্ভর করে না ইহা হৃদয়ের আয়নার স্বচ্ছতার গুণগত মানের উপরও নির্ভর করে। অর্থাৎ অন্তরের স্বচ্ছতা যাহা জিবরাঈলী এনেকাস জিবরাঈলের প্রতিবিম্ব প্রতি-ফলিত হওয়ার শর্ত তাহা সবার মধ্যে কখনও সমান হইতে পারে না। যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, সমস্ত আয়না সম পরিমাণ স্বচ্ছ ও মসৃণ হয় না। কোন কোন আয়না এত বেশী মসৃণ ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে যে, চেহারা দেখিতে যে দাঁড়ায় তাহার সম্পূর্ণ চেহারা অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এবং কোন কোন আয়না এত অমসৃণ অসস্বচ্ছ এবং ময়লায় আবৃত থাকে যে, উহাতে চেহারা মোটেই প্রতিফলিত হইতে পারে না এবং চোহারা দেখাই যায় না। বরং কতক আয়না এই রকম বিগড়ানো থাকে যে, উহাতে যদি ঠোঁট দেখা যায় তবে নাক দেখা যায় না। আবার যদি বা নাক দেখা যায় তাহা হইলে চক্ষু দেখা যায় না। সুতরাং বিভিন্ন লোকের অন্তরের অবস্থাও এ রকমই হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের দিল এতটা সাফ হইয়া থাকে যে, উহাতে পূর্ণ প্রতিফলন হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও হৃদয় ময়লা থাকে যেজন্য জিব্‌রাঈল পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইতে পারেন না। এবং সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে উত্তমভাবে দিলের সাফাই হইয়াছিল আঁ হযরত (সঃ)-এর দিলের; এই ধরনের হৃদয়ের স্বচ্ছতা অন্য কোন ব্যক্তির ছিল না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (চলবে)

– ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১২শ কিস্তি)

এখানে এই নুকতার কথা (গূঢ় রহস্য) বর্ণনা করাও জরুরী মনে করিতেছি যে, খোদাতাআলা যিনি সৃষ্টির আদি কারণ যাঁহার অস্তিত্বের সাথে সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব ওতপ্রতোভাবে জড়িত আছে তিনি যদি কখনও মুরব্বী হিসেবে অথবা শাস্তিদাতা হিসেবে কর্ম চাঞ্চল্য দেখান এবং কোন জিনিসকে তৈরী করার এরাদা করেন তখন সেই সঞ্চালন যদি পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট হয় তখন সমস্ত কিছু যাহা ভূচরাচরে বিদ্যমান সবাই গতিশীল হইতে বাধ্য এবং যদি কোন কোন গুণের কারণে আংশিকভাবে তিনি গতিশীল হন তখন সেই মোতাবেক অণু-পরমাণুর জগতও আংশিক আন্দোলিত হয়। আসল হাকীকত হইতেছে এই যে, খোদাতাআলা যিনি ইজ্জতওয়ালা ও জালালওয়ালা তাঁহার সাথে পৃথিবীর সমস্ত অণু-পরমাণুর ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান, যে সম্পর্ক আছে আমাদের শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুর আমাদের শরীরের সাথে এবং যেভাবে আমাদের শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু ঐ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে যেই দিকে আমাদের রূহ ঝুঁকিয়া পড়ে এবং ঐ জিনিসের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই রূহের তাবেদার হইয়া থাকে, একই সম্পর্ক খোদাতাআলা এবং তাঁহার সৃষ্ট জগতের সাথে বিদ্যমান। আমি সাহেবে ফুসুসের মত (যিনি ফুসুসের লেখক) আল্লাহ্ যিনি হযরতে ওয়াজেবুল ওজুদ (যাহার অস্তিত্ব অবশ্যই সপ্রমাণিত) সম্পর্কে এই কথাতো বলিতে পারি না যে, তিনি সমস্ত জিনিস তৈরী করিয়াছেন এবং আমাদের উপরে আছেন ; কিন্তু এই কথা অবশ্যই বলিব, এই পৃথিবী সেই কাঁচের প্রাসাদের মত যাহার নীচ দিয়া জল প্রবাহিত। সেই জল প্রবল বেগে উহার নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ইচ্ছা করেন তাই সেই প্রস্রবণের জল প্রবাহিত হয়। তেমনিভাবে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তাঁহার ইচ্ছায়ই চলিতেছে। তিনি চালক তাই চলিতেছে। তিনি ছাড়া আর কোন চালক নাই।

পরম প্রজ্ঞাময় একমাত্র আল্লাহ্ গোপন রহস্য আমার উপর প্রকাশিত করিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিশ্ব-জগৎ স্বীয় সমস্ত অংশ অণুপরমাণুসহ সেই সমস্ত কারণের আদি কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে চলিতেছে। তাহাদের নিজেদের কোন অস্তিত্ব নাই যদি না তাহারা সেই আল্লাহ্ হইতে অস্তিত্বে থাকিবার শক্তি পায়। সবসময় তাহারা সেই সর্বশক্তিমান রূহ হইতে শক্তি লাভ করে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় শরীর সমস্ত শক্তি রূহ হইতে লাভ করে এবং এই পৃথিবীর অণু-পরমাণু যাহা সেই চরম অস্তিত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করিতেছে, ইহার কোন কোন জিনিস এই রকম যেন তাহার চেহারার নূর হিসেবে কাজ করিতেছে, তাহারা জাহেরী বা বাতেনীভাবে তাঁহারই ইচ্ছার নূর বিকশিত করিতেছে, এবং ইহার কোন কোন জিনিস এই রকম যেন তাঁহার হাত এবং কোন কোন জিনিস এই রকম যেন তাঁহার পা এবং কোন কোন জিনিস এরকম যেন তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস। মোটকথা হইতেছে এই যে, এই তামাম আলম খোদাতাআলার জন্যে একটি স্বচ্ছ ফটিকের মত ; ইহার জল প্রবাহ ও ঝরণা ধারা সেই ফটিকের মত সেই পরম সত্তা সেই রূহে আযম যাঁহার ইচ্ছা দ্বারা উহারা সঞ্চালিত হইতেছে যিনি তাহাদের কাউয়্যুম বা স্থিতির মূল কারণ -তাঁহার ইচ্ছাতেই উহারা স্থিতি লাভ করে। সেই রূহে আযমের ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি যখন হরকতে আসে বা তাহার ইচ্ছা যখন গতিশীল হয় তখনই সমস্ত বিশ্ব-জগৎ গতি লাভ করে। ঐ চালিকা-শক্তিই প্রকাশিত হয় ইহাদের গতি ও প্রবাহের মধ্যে সেই কাইয়্যুম (সমস্ত স্থিতিবান অস্তিত্বের অস্তিত্ব দানকারী) সত্তার বিকাশেই উহারা সবাই স্থিতিবান। ঐ হরকত বা সঞ্চালন এই স্ফটিকের বিভিন্ন অংশে বা সমস্ত অংশে বা কোন কোন অংশে প্রকাশিত হয় সেই কাইয়্যুমের জাত বা ব্যক্তি-সত্তার ইচ্ছা বা দাবী অনুসারে বা বলিতে পারি আল্লাহ্ যিনি কাইয়্যুম যিনি সমস্ত কিছুর স্থিতির মূল কারণ তিনি তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি অনুসারে উহাদের মধ্যে হরকত পয়দা করেন।

উপরে উল্লেখিত বয়ানকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্যে আমরা একটি কল্পিত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মনে করেন যে, সেই সব চেয়ে বড় স্থিতিবান ও সমস্ত স্থিতির মূল কারণ খোদা এমন এক বৃহৎ সত্তা যে, তাঁহার অগণিত হাত ও অগণিত পা আছে এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত অধিক সংখ্যায় আছে যে, তাহা গণনা করা যায় না এবং ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতাও আমাদের পরিমাপ শক্তির বাহিরে এবং তন্দুরীর (এক প্রকার যন্ত্র) মত ইহার তারও আছে উহার সংখ্যাও গণনার বাহিরে যে সমস্ত তার এই পৃথিবীর বা বিশ্ব-জগতের বিভিন্ন অংশে পরিব্যপ্ত এবং উহারা চুম্বকের মত আকর্ষণ করে ঐ সমস্ত অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাদিগকে অন্য কথায় 'আলম' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যখন কাইয়্যুমে আলম কোন পরিপূর্ণ আন্দোলন করিবেন বা আংশিক আন্দোলন করিবেন তখন সেই আলমের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ আন্দোলন বা আংশিক আন্দোলন দেখা যাইবে, অবশ্য অবশ্যই দেখা যাইবে কেননা, ইহারা তো তাঁহারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করিবেন ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, উহাদেরই সাহায্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশিত হইবে, অন্যভাবে নহে। সুতরাং সাধারণ মানুষের বুঝার জন্যে ইহা একটি আম ফাহ্‌ম মিসাল -সেই রূহানী আম্‌রটিকে বুঝাইবার জন্যে যাহা বলা হইয়া থাকে যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট-বস্তু খোদাতাআলার ইচ্ছা অনুসারে চলে এবং তাঁহার গোপন ইচ্ছাকে তাঁহার সেবকের সেবাকার্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত করিয়া নিজেদের চেহারা ফুটাইয়া তুলে। উহারা সর্বোচ্চ মার্গের আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁহার ইচ্ছার রাস্তায় নিজেদের বিলীন করিয়া দেয় এবং এই ইতায়াত ঐ ধরনের কখনই নহে যাহার বুনিয়াদ হুকুমত বা জবরদস্তি হইয়া থাকে। বরং প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে খোদাতাআলার দিকে একটি চুম্বকের মত আকর্ষণী-শক্তি ক্রিয়া করে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণু নিজের প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে বলিয়া মালুম হয় যেন একটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার শরীরের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকে। অনন্তর প্রকৃতপক্ষে ইহাই সত্য এবং পরিপূর্ণভাবে সত্য যে, এই বিশ্ব-জগৎ ঐ ওজুদে আযমের জন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করিতেছে এবং এইজন্যেই তাঁহাকে কাইয়্যুমুল আলামীন বলা হইয়া থাকে (অর্থাৎ তিনি সবাইকে অস্তিত্ব ও স্থিতি দানকারী)। কেননা, যেভাবে প্রাণ শরীরকে স্থিতি দান করে সেভাবে স্থিতি দান করেন। যদি এই রকমটি না হইত তাহা হইলে সৃষ্টির শৃংখলা বিগড়াইয়া যাইত।

সেই কাইয়্যুমের প্রত্যেক এরাদা বা ইচ্ছা সেটি জাহেরী বা বাতেনী হউক, ধর্মীয় হউক অথবা দুনিয়াবী হউক এই মখলুকাত বা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এবং তাহার এমন কোন ইচ্ছা নাই যাহা এই মাধ্যমগুলি ছাড়া প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাই সৃষ্টির অমোঘ বিধান যাহা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাহেরী বৃষ্টি হওয়ার জন্যে তো তাহারা মেঘের সাহায্যে বারিবর্ষণের জন্যে পৃথিবীতে জলীয় বাষ্পের মাধ্যম স্বীকার করে। এবং নিজে নিজে কুদরতের সাহায্য মেঘ ছাড়া বারিবর্ষণকে অসম্ভব মনে করে। আবার ইলহামের রূহানী বৃষ্টির ব্যাপারে যাহা ছাফ দিলসমূহের উপর ফিরিশ্‌তাদের মেঘ দ্বারা নাযিল হইয়া থাকে উহার কথা শুনিলে হাস্য-বিদ্রূপ করে এবং ইহাকে মূর্খতা মনে করে এবং বলে খোদাতাআলা কী ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজে ইলহাম করিতে পারেন না ? তাহারা এই কথা স্বীকার করে যে, বায়ূর মাধ্যম ব্যতীত শব্দ শ্রবণ করা সৃষ্টির নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু সেই হাওয়া যাহা রূহানীভাবে মানুষের হৃদয়ে ইলহামকে পৌছাইয়া দেয় এই কানুনে-কুদরত হইতে গাফেল। তাহারা এই কথা মানে যে, বাহ্যিক চক্ষুর দর্শনশক্তি প্রয়োগ করার জন্যে সাহায্যকারী মাধ্যম হিসেবে সূর্যের আলোর প্রয়োজন ; কিন্তু রূহানী চক্ষুর জন্যে কোন আসমানী নূর (ঐশী আলো)-এর মাধ্যম প্রয়োজন -ইহা একীন করিতে রাজী নহে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১৩তম কিস্তি)

এখন যখন এই কানুনে এলাহী বা ঐশী বিধান আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ওয়াজিবুল ওজুদ খোদাতাআলার ইরাদা বা ইচ্ছা পূরণ করিতে এই পৃথিবীর যাহা কিছু আছে সবাই অংগ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে, প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় (হাত পায়ের মত) তাহার ইচ্ছা পূরণ করিতে সাহায্য করে। এই সমস্ত অংগ-প্রত্যঙ্গই তাঁহার ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করে। তাঁহার কোন ইচ্ছা এই সমস্ত বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হয় না। এখানে জানা আবশ্যক যে, খোদাতাআলার ওহী যাহা পাক-সাফ দিলগুলিতে নাযেল হয় তাঁহার মাধ্যম হিসেবে ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের অবস্থানকে এক জরুরী মসলা হিসেবে ইসলামী শরীয়তে যে স্বীকার করা হইয়াছে ইহারও কারণ ঐ একই দর্শন (মাধ্যমের দর্শন) যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিশদ বিবরণ এই যে, ওহীর এলকা (অবতরণ) অথবা ওহীর মালকা (ওহী লাভ করার ক্ষমতা) দান করার জন্য একটি মাধ্যম অঙ্গের মত কাজ করে সেই মাধ্যমকে জিব্‌রাঈল নামে আখ্য দেওয়া হইয়াছে- যে যখনই আল্লাহ্ ওহী নাযেলের ইচ্ছা করেন তখন স্বভাবজাতভাবেই আন্দোলিত হয় বা কার্যসাধনে ব্রতী হয় বা হরকতে আসে-- যে কোন দেরী না করিয়া সাথে সাথেই অংগ-প্রত্যঙ্গের মত হরকতে আসে এবং ইহাই সত্য সত্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যখন খোদাতাআলা প্রেমিক অন্তরের দিকে প্রেম নিয়া অগ্রসর হন (মহব্বত করনেওয়ালা দিলের দিকে মহব্বতের সাথে রুজু করেন) তখন জিব্‌রাঈলকে হরকত করিতে হয় সেইভাবে যেইভাবে শ্বাসের হাওয়া অথবা চক্ষুর জ্যোতিঃ গতিশীল হয়, খোদার সাথে তাহার এই প্রকারই সম্পর্ক। অথবা যদি এইভাবে বল যে, খোদাতাআলার গতিশীল হওয়ার সাথে সাথে সে-ও বেলা এখতিয়ার বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেলা ইরাদা বা ইচ্ছার বাহিরে গতিশীল হইতে বাধ্য হয়। যেমনভাবে আসল বস্তুর সঞ্চালিত হওয়ার সাথে সাথে স্বভাবতঃ ছায়াও সঞ্চালিত হইতে বাধ্য। সুতরাং যখন জিব্‌রাঈলী নূর খোদাতাআলার আকর্ষণে, তাহরীক দ্বারা এবং নূখফায়ে নূরানীয়া (আলোকে ফুৎকার করা) দ্বারা সঞ্চালিত হয় তখনই সত্যিকার খোদা-প্রেমিকের হৃদয়ে একটি ছবি অংকিত হয় যাহাকে রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা নামে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে এবং প্রেমিকের সত্যিকার প্রেমের এক গভীর রেখাপাত হয় তাহার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের প্রেমের দ্বারা ; তখন সেই শক্তি খোদাতাআলার আওয়াজ শ্রবণ করার জন্য কর্ণের কার্য সম্পাদিত করে ; এবং তাঁহার আশ্চর্য জিনিসগুলি দেখার জন্য চক্ষু কার্য করে, এবং তাহারই ইলহামাত জিহ্‌বার উপরে জারী করার জন্য জিহ্‌বার মধ্যে এক গতিশীলতা আসে যাহা জোরের সাথে ইল্‌হামের সাথে সাথে গতিশীল হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দিলে এই ক্ষমতা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ রেলগাড়ীর মত পড়িয়া থাকে যাহাকে গতি সঞ্চার করার জন্য উহার সাথে ইঞ্জিনযুক্ত হয় নাই। মানুষের দিল তখন পর্যন্ত অন্ধ থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই যে শক্তি যাহাকে রূহুল কুদুস নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে ইহা সবার মধ্যে সমানভাবে আসে না। বরং মানুষের মধ্যে খোদার প্রেম যেমন কামেল (পরিপূর্ণ) অথবা নাকেস (অপরিপক্ক) হইয়া থাকে তেমনি জিব্‌রাঈলী নূর ও কামেল বা নাকেসভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই রূহুল কুদুস যাহা এই দুইটি মহব্বত একত্রিত হওয়ার পরে ইনসানের (মানুষের) দিলে (অন্তরে) জন্ম লাভ করে জিব্‌রাঈলী নূরের অবতরণের ফলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভের জন্য ইহা জরুরী নহে যে, সবসময় মানুষ খোদাতাআলার পাক কালাম শুনিতেই থাকিবে। বরং ইহা তো আসমানী নূরসমূহ লাভ করার জন্য নৈকট্যের উপকরণসমূহ মাত্র। অথবা এইভাবে বলিতে পার যে, ইহা এক রূহানী রোশনী (আধ্যাত্মিক আলো) যাহা রূহানী চক্ষুকে দেখিতে সাহায্য করে অথবা ইহা এক রূহানী হাওয়া যাহা রূহানী কানকে শুনিতে সাহায্য করে যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে। এবং ইহা পরিষ্কার যে, যখন পর্যন্ত কোন জিনিস সামনে হাজির না থাকে শুধু আলো কোন কিছু দেখাইতে পারে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মোতাকাল্লেম বা কথক কথা না বলে শুধু হাওয়া কোন আওয়াজ শুনাইতে পারে না। সুতরাং এই রৌশনী বা আলো এবং এই হাওয়া রূহানী শক্তিগুলিকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ হইতে মানুষ লাভ করে যেভাবে জাহেরী কানের জন্যে বাতাসকে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এবং যখন বা'রীতাআলার ইচ্ছা এই দিকে মনযোগী হয় যে, স্বীয় বাক্যে তাঁহার কোন মুলহেমের (ইলহাম লাভকারী মানুষ) অন্তরে পৌঁছাতে চাহেন তখন আল্লাহ্ তাহার কথক হিসেবে কথা বলার শক্তিতে একটি ঢেউ উঠে যাহাকে জিব্‌রাঈলী নূরের ঢেউ বলা যাইতে পারে যাহা সেই আওয়াজকে মুলহেমের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় ; অথবা বাতাসে একটি ঢেউ পয়দা হয় যাহা মুলহেমের কর্ণ পর্যন্ত সেই আওয়াজকে পৌঁছাইয়া দেয়, অথবা জিহ্‌বার মধ্যে একটি তাহরীক পয়দা হয় জিব্‌রাঈলী ঢেউ দ্বারা যাহা জিহ্‌বাকে সঞ্চালিত করে, এইভাবে সেই রূহানী জগতে একটি জিব্‌রাঈলী নূরের ঢেউ পয়দা হয় যাহা দ্বারা আল্লাহ্‌র কথা মুলহেমের হৃদয়ে অংকিত হয়, অথবা কর্ণে পতিত হয় অথবা তাহার জবানে জারী হয়। সেই যে জিব্‌রাঈলী নূরের উত্তাপ বা ঢেউ উহা যখন প্রবাহিত হয় তখন মুলহেমের চোখের সামনে আল্লাহ্‌র কথাগুলি কোন কিছুতে লিখিতভাবে ভাসিয়া উঠে, অথবা তাহার কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছিয়া যায় অথবা তাহার জিহ্‌বাতে ইলহামী কথাগুলি জারী হয়। এবং রূহানী অনুভূতি-শক্তি এবং রূহানী রৌশনী ইলহাম হইবার আগে তাহাকে দেওয়া হইয়া থাকে এক শক্তি হিসেবে যেন সে ইলহাম লাভ করিতে পারে, তাহার মধ্যে যেন গ্রহণ করার একটি ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এই দুইটি শক্তি এইজন্য দেওয়া হয় যেন ইলহাম নাযেল হইবার আগে মুলহেমের মধ্যে ইলহামকে ধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। কেননা, যদি এমন অবস্থায় ইলহাম নাযেল করা হয় যে, মুলহেমের দিল এখনও রূহানী অনুভূতি হইতে বঞ্চিত অথবা রূহুল কুদুসের আলো এখনও তাহার অন্তর্চক্ষুকে আলোকিত করে নাই তাহা হইলে সে ইলহামে এলাহীকে কোন্ চক্ষুর পবিত্র আলো দ্বারা দেখিতে পাইবে ! সুতরাং এই প্রয়োজনেই এই দুইটিই মুলহেমকে পূর্বেই দেওয়া হইয়া থাকে। এবং এই তাহকীক (অনুসন্ধান) হইতে পাঠকবৃন্দ এই কথাও বুঝিতে পারিবেন যে, ওহীর ব্যাপারে জিব্‌রাঈলের তিনটি কাজ করিতে হয়।

প্রথমতঃ যখন আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ইলহাম লাভের ক্ষমতা দিতে চান তখন তাহার ফিৎরতের মধ্যে তাহা পয়দা করেন যাহার মধ্যে মানুষের আমলের কোন দখল থাকে না সৃষ্টির প্রথম লগ্নেই আল্লাহ্‌তাআলা তাহার মধ্যে ইলহাম লাভের ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে ইরাদা করেন তখন জিব্‌রাঈল তাহার শুক্রকীট যখন তাহার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তখনই তাহার উপর তাহার নূরের ছায়া অবতীর্ণ করে, ফলে সে ইলহাম লাভ করার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয় তাহার মধ্যে ইলহাম ধারণ করার ক্ষমতা বা খাওয়াস সে পাইয়া যায়। অতঃপর জিব্‌রাঈলের দ্বিতীয় কাজ ইহাতে যে, যখন বান্দার মহব্বত খোদাতাআলার মহব্বতের ছায়ার নীচে আসিয়া যায় তখন আল্লাহ্‌তাআলার মুরুব্বীয়ানা হরকতের কারণে অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ নিজেই যখন তাহার তালীম-তরবীয়ত করেন তখন আল্লাহ্‌র বিশেষ মনযোগের কারণে জিব্‌রাঈলের দায়িত্বে দায়িত্ববান হইয়া নূতনভাবে হরকত করে বা নূতন কর্মচাঞ্চল্য দেখায় এবং খোদার সত্যিকারের প্রেমিকের হৃদয়ের উপরে এক নূর অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ মুহিব্বে সাদেকের দিলের উপরে এক আকসী তসবীর জিব্‌রাঈলের অংকিত হইয়া যায়। যাহা এক রৌশনী বা আলো, হাওয়া বা বাতাস বা গরমী বা উষ্ণতা হিসেবে কাজ করে এবং মুলহেমের ভিতরে ইলহাম লাভের প্রতিভা হিসেবে লুক্কায়িত থাকে। মুলহেমের দিলের একটি অংশ জিবরাঈলী নূরের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং দ্বিতীয় জিব্‌রাঈল মুলহেমের দিলের ভিতরে প্রবেশ করে যাহাকে অন্যকথায় বলা যাইতে পারে রূহুল কুদুস বা তাহার তসবীর বা প্রতিবিম্ব (চলবে)।

অনুবাদ- ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(শেষ কিস্তি)

জিবরাঈলের তৃতীয় কাজ হইতেছে এই যে, যখন খোদাতাআলার তরফ হইতে কোন কালাম প্রকাশিত হয় তখন হাওয়ার মত প্রবাহিত হইয়া উহা মুলহেমের দিলের কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া অথবা আলোর মত বিচ্ছুরিত হইয়া উহা মুলহেমের অন্তরের চক্ষুতে উদ্ভাসিত করা অথবা তাহার দিলে উষ্ণতা পয়দা করিয়ে তাহার জিহ্বাকে সঞ্চালন দ্বারা উহাকে অর্থাৎ বাক্যকে তাহার জবানের উপরে জারী করা দ্বারা তাহার জবানকে এলহামী আলকাজের দিকে লইয়া যাওয়া। এই জায়গায় আমি ঐ সমস্ত লোকদের অমূলক সন্দেহও দূর করিতে চাই যাহারা মনে করে আওলিয়া এবং আম্বিয়াদের এলহাম এবং অন্যান্য লোকদের এলহামের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে। কেননা, অলীগণ এবং নবীগণ যেমন গয়ের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন অন্যান্য লোকেরাও তো এমনিভাবে গয়েবের এলেম লাভ করিয়া থাকেন কখনও কখনও। বরং কোন কোন সময়ে সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। এবং কোন কোন বদমাইশ এবং অতি নীচ জঘন্য প্রকৃতির লোকও কোন কোন সময় এমন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে যাহা সত্য বলিয়া ফলিয়া যায়। সুতরাং ঐ লোকদিগের সাথে যাহারা নিজেদেরকে নবী অথবা অলী বলিয়া মনে করেন এই ধরনের খারাপ আচরণের লোক যাহারা খারাপ আচার-আচরণ এবং বদমাইশীর মধ্যে লিপ্ত তাহারাও সত্য-স্বপ্নের মধ্যে শরীক আছে যাহারা বদমাইশী এবং খারাপ চাল-চলনের মধ্যে নিমগ্ন এবং বদমাইশীর রাস্তায় দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সর্বাগ্রে আছে তাহাদের মধ্যে আর নবী ও অলীদের মধ্যে কি ফযিলত আর বাকী থাকিল ? সুতরাং ইহার জবাবে আমি বলিতেছি যে, এই প্রশ্নের আসল দিক চিন্তা করিলে ইহা দুরস্ত এবং সব ঠিক আছে। কেননা, জিবরাঈলের নূরের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারিত যাহার মধ্যে হইতে কোন ফাসেক, ফাজের ও বদকারও বাহিরে নহে। বরং আমি এপর্যন্ত মানি যে, অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে যে, কোন কোন সময়ে এক নেহায়েৎ ফাসেক আওরত যে, পতিতাদের অন্তর্ভুক্ত সে-ও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ফেলে যদিও তাহার তামাম জওয়ানী বদকারীর মধ্যেই কাটিয়াছে। এবং আরও বেশী আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধরনের মেয়েলোক যে রাতে তাহার খরিদ্দারের সাথে সহবাস করে সেই বিছানায়ই অপবিত্র অবস্থায়ই সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ফেলে যাহা ফলিয়া যায়। কিন্তু এইকথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরনেরই হওয়া উচিত ছিল। কেননা, জিবরাঈল তো সমস্ত নূরের হেড কোয়ার্টার। সে তো সূর্যের মত সারা পৃথিবীতে সমভাবে আলো বিতরণ করিতেছে যাহার যেই রকম ধারণ ক্ষমতা আছে সে সেই অনুপাতে তাহা আহরণ করিবে, সেই অনুপাতে জিবরাঈল তাহার উপরে প্রভাব ফেলিবে এবং কোন মানুষের আত্মা এমন নাই যে, একবারেই অন্ধকার, কমপক্ষে একবিন্দু হইলেও নূর তাহার মধ্যে আছে। আসল যে ঠিকানা তাহার প্রতি মহব্বত অণুপরিমাণ হইলেও অবশ্যই আছে, আসল প্রেমাস্পদের জন্যে প্রেম প্রত্যেকে সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে তাহা বালূকণিকার মতই হউক না কেন। এই অবস্থায় ইহা নেহায়েৎ জরুরী যে, তামাম বনী আদমের উপরে জিবরাঈলের আসর (প্রভাব) অবশ্যই হইবে এমনকি পাগলদের উপরেও এই প্রভাব থাকিতে হইবে এবং আছেও আসলে। কেননা, পাগলেরাও যাহাদিগকে সাধারণ লোকেরা "মজ্জুব" বলে যাহারা সব মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহাদের এই "এনকেতার" কারণে এক সময়ে জিবরাঈলের নূরের নীচে আসিয়া পড়ে তখন কিছু কিছু বাতেনী নূর তাহাদের চক্ষুর মধ্যে পড়ে যাহার ফলে তাহারা খোদাতাআলার গোপন কার্যক্রমের ভেদ (তাসাররুফাতে খুফিয়া) কিছু কিছু দেখিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সত্য-স্বপ্নের কারণে নবুওয়ত ও বেলায়েত এর উপর কোন আঁচড় লাগে না। এবং তাহাদের শানে বুলন্দ এর মধ্যে কোন ফরক পড়ে না। তাঁহাদের মর্যাদা অনেক উচ্চ। ইহাতে কোন ঘাটতি হয় না এবং হয়রান হওয়ার কোন কারণ ঘটে না। কেননা, এই দুইয়ের মধ্যে এমন এক প্রকাশ্য পার্থক্য বিদ্যমান যে, পরিষ্কারভাবে যাহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহারা বুঝিতে পারে এবং সেই পার্থক্য এই যে, আওয়াম এবং খাওয়াসের মধ্যে (সাধারণ এবং বিশেষ বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে) এই পার্থক্য যে, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সমূহের যে গুণগতমান ও সংখ্যাগত সংখ্যাধিক্য দুইটিরই বৈশিষ্ট্য এমন হয় যে, বিশেষ লোকদের স্বপ্নের সংখ্যাধিক্য ও গুণগত মানের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকে দুইটি;একটি আরেকটির সংখ্যাগত মানে এবং গুণগতমানে নিকটবর্তী হইতে পারে না কিছুতেই। যাহারা আল্লাহ্‌র খাস বান্দা হইয়া থাকেন তাহারা অসাধারণভাবে নেযতে গয়রী (গয়বের নে'য়ামত) থেকে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। দুনিয়ার মানুষ ঐ সমস্ত নেয়ামতের যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে শুধু ঐভাবে শরীক হইয়া থাকে যেভাবে শাহে ওয়াক্‌ত, সমকালীন রাজার সাথে একজন ভিক্ষুকের যে সাদৃশ্য হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে যে, ভিক্ষুকের কাছে একটি দেরহাম আছে রাজার কাছেও কোটি কোটি দেরহাম আছে ধনভান্ডারে। দুইজনই দেরহাম বা মুদ্রার মালিক। একজনের কাছে একটি আরেকজনের কাছে কোটি কোটি। কিন্তু ইহা পরিষ্কার যে, এই তুচ্ছ সাদৃশ্যের কারণে বাদশাহের শানে কোন ফরক পড়ে না এবং ভিক্ষুকেরও মর্যাদা বাড়িতে পারে না। এবং যদি চিন্তা করিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সূর্যেরও আলো আছে আবার জোনাকী পোকারও আলো আছে। দুইজনের শান বা মর্যাদা সমান নহে। এই দুইয়ের মধ্যে আলোর অংশীদারিত্বের মর্যাদার সাদৃশ্য আছে বলিয়া জোনাকী পোকার মর্যাদা সূর্যের মর্যাদার সমান হইতে পারে না। সুতরাং জানিয়া রাখা উচিত যে, তামাম ফযিলত (সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব) আলা দরজার কামাল (অতি উচ্চ স্তরের পরিপূর্ণতার) দ্বারা যাহা গুণগত মান ও সংখ্যাগত মান দ্বারা আহরিত হয় তাহার উপরে নির্ভর করে। ইহা নয় যে, একটি হরফ চিনিতে পারিলে একজন ফাযেলে আজল বা মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সমান হইয়া যাইবে অথবা অকস্মাৎ এক শ্লোক পংক্তি কবিতা বানাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই বড় বড় শায়ের বা কবিদের সমান হইয়া যাইবে। ছোট ছোট মিসাল বা সাদৃশ্যের ব্যাপারে কোন প্রজ্ঞা বা প্রশাসনিক ক্ষমতা কোনটার ব্যাপারেই কোন অপ্রতুলতা নাই। যদি এক বাদশাহ্ সারা দুনিয়ার উপরে হুকুমত করে তাহা হইলে এক মজদুরও তাহার ঝুপড়ির মধ্যে তাহার বিবি-বাচ্চার উপরে হুকুমত করে। বাকী রহিল এই কথা যে, খোদাতাআলা নেকবখ্‌ত এবং বদ্‌বখত (ভাগ্যবান এবং দুর্ভাগাদের)-দের মধ্যে কেন সাদৃশ্য রাখিলেন এবং গয়েবের নেয়ামতের অংশীদার বানাইলেন। ইহার জওয়াব এই যে, অভিযুক্ত করার জন্য এবং এতমামে হুজ্জতের জন্য অর্থাৎ দলীল প্রমাণকে পূর্ণতা দান করার জন্য যেন এই বীজ সদৃশ অংশীদারিত্বের কারণে প্রত্যেক অস্বীকারকারী কামেলীনদের কামালাতে সাক্ষী হয়। কেননা, যখন তাহারা

নিজেদের এই ছোট দায়েরা এস্তেদাদা (ক্ষমতার ছোট বৃত্তের) ভিতরে থাকিয়া ঐ বিষয়গুলির কিছু নমুনা দেখিতে পায় যাহা কামেলীদের জবান থেকে শুনে। সুতরাং এই অল্প বিষয়ের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করা আর সম্ভবপর হয় না। অনন্তর তাহারা এই সাদৃশ্য থাকার কারণে খোদাতাআলার এলজামের নীচে আসিয়া যায়, যাহার কারণে অস্বীকার করিলে খোদাতাআলা তাহাকে পাকড়াও করিবেন (যে তোমার কাছেও তো এলহাম হয়। তুমি এলহামের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার কর কীভাবে)। যেমন আজকালকের আর্য সমাজীরা মনে করে যে, চারিটি বেদ নাযিল করার পরে খোদাতাআলা একেবারেই চুপ হইয়া গিয়েছেন চিরকালের জন্য । ওহী এলহামের পাতাকে চিরকালের জন্যে মুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু খোদাতাআলার কানুনে কুদরত বা সৃষ্টির অমোঘ বিধান তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। কেননা, তোমরা যখন নিজেদের চোখে দেখিতেছ যে, এই গয়েবের খবরের প্রকাশের সিলসিলা এখন পর্যন্ত জারী আছে এবং তাহার মধ্যে ফাসেক লোকও কখনও কখনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ফেলে। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, সেই খোদা যিনি তাহার রূহানী ফয়েয (আধ্যাত্মিক কল্যাণ) নাযিল করার ব্যাপারে এই যামানাতেও দুনিয়াদার এবং ফাসেকদেরকেও বঞ্চিত করেন না এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক বহু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও তাহাদেরকে (আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভুষিত করেন) তাহাদেরকেও সত্য-স্বপ্ন দর্শন করান, তাহা হইলে তিনি তার নেক বান্দা যাহারা তাঁহার সহিত সামঞ্জস্য রাখে তাহাদের উপর কি তিনি কোন কিছু নাযেল করেন না ? কেন করেন না? আর একটি গুপ্ত রহস্য এই বীজ সদৃশ্য অংশীদারিত্বের এই যে, কোন ব্যক্তি যতই ফাসেক বা বদকার হউক না কেন অথবা কাফের রক্ত-পিপাসু হউক না কেন এই অংশীদারিত্ব হইতে বুঝিয়া নিতে সক্ষম হইবে যে, খোদাতাআলা তাহাকে ধ্বংস করার জন্য পয়দা করেন নাই, বরং তিনি তাহার ভিতরে উন্নতি করার ক্ষমতা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন এবং তাহাকে বীজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে সে আগে কদম বাড়াইতে পারে এবং প্রকৃতিগতভাবে সে খোদাতাআলার নেয়ামত হইতে বঞ্চিত নহে। হ্যাঁ, যদি সে নিজে খারাপ রাস্তায় চলিয়া তাহার ভিতরের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে না লাগাইয়া বঞ্চিত হয় এবং ঐ সমস্ত স্বাভাবিক তরীকা যেগুলি দ্বারা নাজাত পাওয়া যায় জানিয়া-বুঝিয়া পরিত্যাগ করে তাহা হইলে উহা তাহার কৃতকর্মের কারণে উহার পরিণাম ফল তাহাকে ভুগিতে হইবে।

অনুবাদ- ওবায়দুর রহমান ভূইয়া